বিংশ শতাব্দী

[আশা-কাব্য।]

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক
বিরচিত।

[উত্তর বিভাগ।]

কলিকাতা,
২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৮ সাল।

হি

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

অঞ্জনা নদীর কাল জলে প্রতিকূল বাতাসে ঢেউ উঠিয়াছে। সারি সারি ঢেউ সার গাঁথিয়া চলিতেছে। নদীর তটবিভাগে এক বিস্তীর্ণ মহারণ্য, নিকটে লোকের বসতি নাই। জলের কিনারা হইতে ঘনসন্নিবিষ্ট বন্য পাদপশ্রেণী ক্রমশঃ উচ্চদিকে উঠিয়াছে। অতিশয় ঘন নিবিড় বন, ভিতরে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না। কাল জলের পার্শ্বে হরিৎ কান্তি বনরাজী, দৃশ্য অতি গম্ভীর, নয়নস্নিগ্ধকর এবং শান্তিব্যঞ্জক। এই নদীর ধারে বনপ্রান্তরে এক তরুতলে একটী উদ্ভ্রান্ত চিত্ত বিষণ্ণ বদন যুবক তটিনীর তরঙ্গশ্রেণীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল। যুবার বাহ্য মালিন্যের ভিতর দিয়া স্বভাবসৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। দেখিলেই মনে হয় যেন কোন আন্তরিক গভীর ক্লেশে তাহার সুদীর্ঘ সুন্দর তনুকে শ্রীহীন করিয়া ফেলিয়াছে। মুখকান্তি, চক্ষের দৃষ্টি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিস্তেজ; তাহার মলিন বেশ দর্শনে কতকটা পাগল বলিয়াও জ্ঞান হয়।

যুবক আপনার জীবনবন্ধু হৃদয়সখার প্রেমমাধুরী স্মরণ করিয়া এক একবার অর্দ্ধস্ফুট স্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন। বিরহ ব্যাকুলতায় তাঁহার শরীর মধ্যে মধ্যে কম্পিত এবং রোমাঞ্চিত হইতেছিল। ব্যথার ব্যথী চির সহচরকে হারাইয়া আকুল কণ্ঠে এই বলিয়া তিনি খেদ করিতে লাগিলেন,—"হায় আর কি আমি সেই প্রাণসখার দেখা পাইব না! সংসারে থাকিয়া আমি আর তবে কি করিব, কোথায় যাইব। আরত আমার কোন কাজ ভাল লাগিবে না! হাত পা আরতো উঠিবে না। কা'র মুখপানে চাহিয়া পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট সহ্য করিব! হৃদয়টা আমার যেন একবারে খালি হইয়া গিয়াছে। আহা সে প্রেম-নয়নের স্নেহদৃষ্টি, প্রসন্ন মুখের মধুর বাক্য কি মনোহর! আবার যদি পাই, তাহা হইলে আরো ভাল বাসিব, খুব সেবা করিব, প্রাণে প্রাণে মিশে যাব। কিন্তু আমি কার আশা করিতেছি! সে কি আর আছে?

আচ্ছা সে যদি নাই, তবে আমি কেন রইলাম ; মরিলে কি আবার বাঁচে না ? আমি তবে কিরূপে বাঁচিলাম ? প্রাণের টান আমার সেই দিকেই ক্রমাগত ধাবিত হইতেছে, কে তাহাকে প্রবোধ দিয়া রাখিবে ? সকল ছেড়ে আমি যে তাকে সার করিয়াছিলাম ! অহো ! কালের কি দুর্জ্জয় পরাক্রম। এক নিমেষের মধ্যে কে কোথায় চলিয়া গেল ! ভাই রে তুই কোথা ?" এই বলিয়া যুবক শোকে অধীর এবং নিস্তব্ধ হইল।

শূন্য প্রান্তরে শূন্য আকাশে শূন্য চক্ষে নিরাশ ভগ্নান্তরে সে আবার ক্ষণকাল পরে চাহিয়া দেখিল। বোধ হইল দূর হইতে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা নীলরঙ্গের পালভরে দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে নৌকা সমীপবর্ত্তী হইল। তাহার ক্ষুদ্র ছইয়ের ভিতরে একটী মোহনমূর্ত্তি সুপুরুষ বসিয়াছিলেন। তিনি কোথায় যাইতেছেন, কেন যাইতেছেন তাহা মনে নাই ; ভাবনায় ভোর, হৃদয় উদাস, চিত্ত বিভ্রান্ত। অন্যমনস্ক হইয়া তিনি ভাবিতেছেন, হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠের পরিচিত স্বর কর্ণে প্রবেশ করিল। তটস্থ যুবা তখন আর্ত্তস্বরে বিষাদসঙ্গীত গান করিতেছিলেন। তৎপ্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র আগ্রহ সহকারে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, গঙ্গা এখান হইতে আর কত দূর ?" সহসা সে শব্দ শ্রবণে যুবকের অবসন্নতা জড়তা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সচকিত নেত্রে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নৌকার পানে চাহিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "এ কি ! এ দূর দেশে চিরপরিচিত কণ্ঠরব কোথা হইতে আসিল।" তখন প্রশ্নকর্ত্তার সঙ্গে চক্ষে চক্ষে তাঁহার মিলন হয় নাই। তদনন্তর বিপরীত বাতাস দেখিয়া মাঝি পাল ফেলিয়া দিয়া সেই খানেই নৌকা ভিড়াইল। আরোহী ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তটস্থ উন্মাদবৎ যুবা বিহ্বল হইয়া "অ্যাঁ ! তুমি কোথা থেকে এলে !" এই বলিয়া সবেগে জলে নামিয়া লাফ দিয়া সে নৌকায় উঠিল। আরোহী হঠাৎ তাহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া ভীত, বিস্মিত এবং হতবুদ্ধি হইলেন। পরে সে যখন দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল তখন তিনি চিনিতে পারিলেন। চিনিতে পারিয়া উভয় উভয়কে বুকে জড়াইয়া "হায় তারা কোথা গেল।" এই বলিয়া চিৎকার ক্রন্দন।

আরোহী আমাদের সেই প্রিয়তম বিশ্বম্ভর, তটস্থ যুবা অমরনাথ। ঝড়ের দিনে নৌকা জলমগ্ন হওয়ার পর ইঁহারা দুই জন ভাসিতে ভাসিতে দুই

স্থানে গিয়া উপনীত হন। অমর এই বনমধ্যস্থিত এই সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক রক্ষা পান। বিশ্বম্ভর ভাসিতে ভাসিতে নিকটবর্ত্তী এক নীলকুঠীতে গিয়া উঠেন, পরে কুঠীর লোকেরা তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক তথায় রাখিয়া কিছু দিন পরে বাড়ী পাঠাইয়া দেয়।

অমর বলিলেন, "তুমি কিরূপে রক্ষা পাইলে? বাঁচিবারত কথা নয়। আহা ভগবানের কি বিচিত্র লীলা!"

বিশ্বম্ভর বলিলেন, "আমি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া কতক্ষণ কোথায় ছিলাম কিছুই জানি না। প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া ব্রহ্মক্রোড়ে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলাম এই মাত্র কেবল স্মরণ আছে। পরে সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রে চেতনা লাভ করিয়া দেখি, একগলা জলে দাঁড়াইয়া আছি। নৌকা মাঝি কেহ তথায় নাই। কিন্তু তখন ঝড় থামিয়া গিয়াছে, আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়াছে। নক্ষত্রালোকে দিক্ নিরূপণ করিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে লাগিলাম। কোথাও কম জল, কোথাও বেশী, কোথাও বা ভীষণ বেগে স্রোত বহিয়া যাইতেছে। প্রকাণ্ড চড়া জলে ডুবিয়া গিয়াছে। যেখানে বেশী জল সেখানে সাঁতার দিয়া পার হইয়াছিলাম। দেখি যে জল আর শেষ হয় না। অনেকক্ষণ পর পূর্ব্ব দিক ফর্সা হইয়া উঠিল। শরীরও তখন আমার শ্রান্ত ক্লান্ত শীতে অবশাঙ্গ হইয়াছে। অনন্তর প্রাতে উষার আলোকে একটী নীলকুঠী দেখিতে পাইয়া তথায় আশ্রয় লইলাম। কুঠীর কর্ম্মচারিগণ যত্নপূর্ব্বক অগ্নির উত্তাপ এবং উষ্ণবস্ত্র দিয়া শুশ্রূষা করিলেন।"

দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে অমরের দুই চক্ষে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পরে দুই জনে প্রকৃতিস্থ হইয়া শোকভারাক্রান্ত চিত্তে বনমধ্যে সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। নৌকা বিদায় দিলেন। অমরনাথ বলিলেন, "তুমি যে পূর্ণানন্দ স্বামীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলে তিনিই এখানে থাকেন। আমাকে সন্তানবৎ স্নেহ করেন। তোমার জন্য তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন আছেন। আমিও এবার মরিয়া বাঁচিয়াছি।"

বিশ্ব। আর সকলে কোথায় গেল? প্রাণে বাঁচিয়া আছে কি বলিতে পার? তুমিত তাদের সঙ্গেই ছিলে।

অমর। কিছুই জানি না। কেমন করে এখানে এলাম, বাঁচিলামই বা কিরূপে, কিছুই জানি না।

প্রথমে জলস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এই ঘাটের কিনারায় আসিয়া

উপনীত হই। তার পর এই বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একে নিবিড় কানন, তাহাতে অন্ধকার রাত্রি, তাহার উপর শরীর দুর্ব্বল, মুমূর্ষু প্রায় হইয়া প্রাণের দায়ে এদিক ওদিক পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কিছুতেই আর পথ পাই না, যেদিকে যাই গাছে ধাক্কা লাগে। বৃক্ষের ডালে ঝোপের মধ্যে সাপেরা আশ্রয় লইয়াছে। কোথাও ডালে জড়াইয়া আছে, কোথাও বা ঝুলিতেছে। পিছল পিছল ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সাপের শরীরের সহিত আমার সংঘর্ষণ হইতে লাগিল। কখন বা দুই একটা সাপ গলা জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। কিন্তু কেহ দংশন করিল না। বন্য জন্তুর পায়ের শব্দও মাঝে মাঝে পাইতে লাগিলাম। অনন্ত অন্ধকারে ঢাকা অনন্ত গহন বন, কোন দিকে আর সীমা পাইলাম না। শেষ একটী ছোট সরু পথের মত পাইলাম। কিন্তু কতক্ষণ আর হাঁটিব, যাবই বা কোথায়? কতক দূর গিয়া এক স্থানে বসিয়া পড়িলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন, শ্রান্তিবশতঃ চক্ষে একটু তন্দ্রা আসিল। তদবস্থায় অদূরে "হরি ওং" "হরি ওং" এই মধুর নিনাদ শুনিতে পাইলাম। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। পরে একটী কুটীর দেখা গেল, তাহার প্রাঙ্গণে ধুনি জ্বলিতেছে, তৎপার্শ্বে এক যোগী বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। আমার দুরবস্থা দেখিয়া স্বামীজী আমাকে শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইলেন।

বিশ্বম্ভর রোমাঞ্চিত হইয়া ভক্তিবিগলিত চিত্তে বলিলেন, "অভাবনীয় ঘটনা! আহা দয়াময়ের কি অপার করুণা! তিনি মারিয়া আবার বাঁচাইয়া দেন।"

অতঃপর দুই জনে কথা কহিতে কহিতে স্বামীজীর আশ্রমে আসিয়া সমাগত হইলেন।

বনবাসী সাধুর শান্ত মূর্ত্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া বিশ্বম্ভর তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। স্বামী তাঁহাদের দুই জনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মহামিলনের বিধান বিস্তার জন্য তোমাদের জন্ম। এই জন্যই পুনর্ব্বার মরিয়া বাঁচিয়াছ। সকল বিঘ্ন কাটিয়া যাইবে। শোক সন্তাপ পরিহার কর।"

বিশ্বম্ভর যোগীর মুখে হঠাৎ এই আশাতীত আশাবাক্য শুনিয়া সিহরিয়া উঠিলেন। তাঁর প্রাণের মধ্যে এক স্বর্গীয় দৈবশক্তি সঞ্চারিত হইল। আশা বিশ্বাসে ভগ্নচিত্ত জাগিয়া উঠিল।

স্বামী মহাশয় আশীর্ব্বচনের পর নীমিলিত নয়নে ধ্যানস্থ হইলেন।

নির্জ্জন নিস্তব্ধ নিবিড়ারণ্য, তন্মধ্যে শান্তচিত্ত যোগী পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন। আশ্রমপ্রাঙ্গণের সুপরিষ্কৃত ভূমিতলে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্বম্ভর অমরনাথ স্থির নেত্রে সেই দিব্যমূর্ত্তি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর বয়ঃক্রম এক শতের কিছু উপর হইবে। তাঁহার নিস্পন্দ ললাট গণ্ডস্থল এবং মুদ্রিত নয়ন ভেদ করিয়া ব্রহ্মজ্যোতি দীপ্তি পাইতেছিল। তদীয় প্রশান্ত গম্ভীর প্রকৃতি, শ্বেতশ্মশ্রুকেশাবৃত মস্তক এবং মুখমণ্ডলের প্রভা অবলোকনে আগন্তুক অতিথিদ্বয়ের চিত্ত চমকিত হইল। মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝা যায়, ভিতরে দর্শনানন্দের এবং শ্রবণানন্দের স্রোত বহিতেছে। যোগীর পবিত্র অঙ্গের পদ্ম গন্ধে বনভূমি অতিমাত্র আনন্দময় বোধ হইতেছিল।

ক্ষণকাল পরে হাস্য মুখে মধুর স্বরে তিনি বলিলেন, "তোমরা যে কার্য্যে ব্রতী আছ, আমি তাহারই জন্য এখানে তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছি। পৃথিবীতে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবানের দ্বারে ভিক্ষা চাহিতেছি। আমরা সকলে একই।"

স্বামীজীর মুখে এই আশার কথা শুনিয়া বিশ্বম্ভরের এক গুণ বিশ্বাস দশ গুণ হইল। তাঁহার হৃদগত নিগূঢ় বিশ্বাস যেন শতধা হইয়া জ্বলিয়া উঠিল।

বাবাজী বলিলেন, "কেবল আমি একা নহি, অমরাত্মা ভক্তগোষ্ঠী সকলেই এই জন্য নিরন্তর দেবদেব পরমদেবের সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছেন। তুমি আর কাল বিলম্ব করিও না। শীঘ্রই মহালীলা আরম্ভ হইবে। স্বর্গ হইতে এই বিজয় নিশান অবতীর্ণ হইয়াছে। এই লও, গ্রহণ কর! পুনরায় নববৃন্দাবনে আমরা একসঙ্গে মিলিব।"

এই বলিয়া বাবাজী এক লোহিত বর্ণের "মহামিলন" অঙ্কিত বিচিত্র জয় নিশান বিশ্বম্ভরের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক প্রেমভরে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। নিশান স্পর্শমাত্র বিশ্বম্ভরের আপাদ মস্তক যেন বিদ্যুৎ বহ্নির জ্যোতিতে প্রতিভাসিত হইল। অনন্তর তিনি এবং অমর স্বামীজীর পদধূলি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক স্বর্গদূতের ন্যায় বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। নববৃন্দাবনের নাম শ্রবণে তাঁহাদের হৃদয়ে মহাভাবের উদয় হইয়াছিল।

পথে আসিতে আসিতে এক একবার অন্তরে শোকশিখা জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। "কোথায় গিয়া দাঁড়াইব, আত্মীয় বন্ধু সব হারাইলাম, হায়!

প্রেমরাজ্য গড়িব কাহাকে লইয়া?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শান্তিধামে আসিয়া উপনীত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলেন, পরিবারস্থ স্ত্রীলোক বালক এবং আর আর সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বিষম শোকে তাহারা মৃতবৎ নির্জীব। সহসা তাহারা যখন ইঁহাদের দুই জনকে দেখিল, তখন অমনি মহা বেগে উন্মাদপ্রায় ছুটিয়া আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল। কেহ পায়ে লুটাইতে লাগিল। আহা সে কি আনন্দ! যেন নিমেষের মধ্যে মরা মালঞ্চে ফুল ফুটিয়া উঠিল। শোকাশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরিণত হইল। অপর তিন খানি বজরা জলমগ্ন হয় নাই। কেবল অমরনাথ আর সকলকে বাঁচাইতে গিয়া কি গতিকে জলে পড়িয়াছিলেন।

বিপদ ভয় মৃত্যু শোকের ভিতরে বিধাতার বিশেষ করুণা দেখিয়া শান্তি-ধামের বিশ্বাসী ভক্তবৃন্দ তখন আশা উৎসাহের সহিত পুনরায় প্রেমরাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। শান্তিধামের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে দেবদত্ত বিজয় নিশান উড়িল, মঙ্গলবাদ্য বাজিল, মহা মত্ততার সহিত মহা হরিসঙ্কীর্ত্তন হইল। পরে দিনের পর দিন বিশ্বম্ভরের নাম দেশের নানা স্থানে বিস্তার হইয়া পড়িল। যে সকল নরনারী প্রচলিত ধর্ম্মসমাজ সকলের জীবনহীন শুষ্ক অবস্থায় পড়িয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহারা ক্রমে উক্ত দলের ভিতর মিশিলেন। কেহ কেহ বা শান্তিধামের অধিবাসীও হইলেন। এখানকার কাজ কর্ম্ম এবং ধর্ম্মসাধন তাঁহাদের তাপিত প্রাণে শান্তি বিধান করিল।

আমরা এখন বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই সময়ে জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে পুনরায় সর্ব্বতোভাবে একটী নব যুগের অভ্যুদয় হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সমাজসংস্কার কার্য্যের মূলে কিঞ্চিৎ জীবন্ত বিশ্বাস, ভক্তি ও স্বর্গীয় সুনীতির আলোক প্রবেশ করিয়াছিল। সাধারণ সৎকার্য্যের নেতৃগণের মধ্যে অনেক ভগবদ্ভক্ত সাধু

ব্যক্তি দৃষ্ট হইত। ইহারা ইংরাজি রাজপুরুষগণের সহিত মিলিয়া ভ্রাতৃভাবে অনেকানেক গুরুতর রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাহাতে উভয় জাতির মধ্যে কতকটা বেশ সদ্ভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। যেখানে হরিভক্তি এবং ভ্রাতৃপ্রেম সেখানে কি না আশা করা যাইতে পারে?

এই শুভ পরিবর্ত্তনের মূলে কয়েকটী বিশেষ কারণ লক্ষিত হয়। মারকুইস্ গড্‌লীর সময়ে যে উন্নতির কথা ইতিপূর্ব্বে আমি উল্লেখ করিয়াছি তাহার স্রোত ক্রমে মন্দ হইয়া আইসে। পরবর্ত্তী প্রধান রাজপুরুষেরা কিছু নাস্তিক স্বেচ্ছাচারী গোঁচের লোক ছিলেন। তাহাতে নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারী এবং অধম শ্রেণীর অভদ্র ইংরাজেরা কিছু প্রশ্রয় পায়, সুতরাং পূর্ব্ব যুগের সেই সকল মন্দভাব পুনরায় আবার জাগিয়া উঠে। কিন্তু জাতীয় উন্নতির স্রোতকে বলপূর্ব্বক প্রতিরোধ করিতে গেলে স্বভাব আপনিই তাহার প্রতিশোধ লয়। তটিনীপ্রবাহকে কি কেহ পুনরায় উৎসের ভিতর পুনঃপ্রবেশ করাইতে পারে? এ জন্য রাজা প্রজা জিত জেতা উভয়কেই মধ্যে কিছু দিন আবার অশান্তি ভ্রাতৃবিচ্ছেদ মনঃপীড়া সহ্য করিতে হইয়াছিল।

ইয়ুরোপীয় বিদ্যা সভ্যতার প্রভাবে এক্ষণকার ভারতীয় প্রজাগণ সাধারণতঃ কতকটা সাহসী এবং স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে। এত দূর অগ্রসর হইয়াছে যে ধমক দিয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া আর কেহ পশ্চাতের দিকে তাহাদিগকে ঠেলিয়া দিতে পারেন না। কূপের মীন, পুষ্করিণীতে, তাহার পর নদীতে, এক্ষণে সমুদ্রে পড়িবার উদ্যোগ করিতেছে। বিশেষতঃ মহাত্মা গড্‌লী এবং তস্য উচ্চমনা সহযোগীদিগের সমাদরে এবং সুবিচারে শিক্ষিত দল এক্ষণে সৎ সাহস এবং ভদ্রতার সহিত চলিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা আত্মমর্য্যাদা এবং মনুষ্যের মহত্ত্বের মূল্য কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহাদের পিতা পিতামহেরা যেমন নিরাপত্তিতে শ্বেতাঙ্গের নির্য্যাতন অপমান সহ্য করিয়া আপনারাই আবার ক্ষমা চাহিত, ইহারা আর তেমন পারে না; মাঝে মাঝে সুবিধা পাইলে আস্তিন গুটায, ঘুঁশোটা আসটা চালায। ইংরাজি সভ্যতার স্পিরিট্ ব্রিটিশপ্রভাব ঘুমাইবার জিনিষ নয়। তাহা নিগ্রো দাসকেও কালে স্বাধীন নির্ভীক করিয়া তোলে। আবার ইংরাজও রাজজাতি, মহা গৌরবশালী, ধন মান বুদ্ধি বলে মহা অহঙ্কৃত, অধিকন্তু সুরাপায়ী গোমাংসভোজী, সুতরাং নেটিভ তাবেদার ও প্রজাদিগের বেয়াদবি স্বাধীনতা সহ্য করিতে পারে না। নানা কারণে এই মধ্যের

সময়টীতে প্রায়ই পথে ঘাটে ট্রেনে ট্রামে ষ্টীমারে আফিসে উভয় দলে মারামারি ঘুশা ঘুশি দন্তঘর্ষণ দুর্ব্বাক্য প্রভৃতির বিনিময় হইত। কোন সাহেব অধীনস্থ কেরাণী বাবুকে সামান্য কারণে মিথ্যাবাদী ছোট লোক বলিয়া মারিতে গেলেন, শ্রান্ত ক্লান্ত অতিরিক্ত পরিশ্রমে কাতর বাবুও দাঁত খিচাইয়া রুল ধরিয়া দাঁড়াইল। নবাগত গর্ব্বিত যুবক সিভিলিয়ান বগী হাঁকাইয়া যাইতেছেন, সম্মুখে কেরাঞ্চি গাড়ী দেখিয়া তাহার কোচমানকে চাবুক মারিলেন, সেও তাহার যথাসাধ্য প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে দেশীয় কোন ভদ্রলোক সপরিবারে যাইতেছিলেন, এক জন শ্বেতাঙ্গ আসিয়া বলিলেন, "বাবু! তুমি অন্য গাড়ীতে যাও।" তিনি বলিলেন, "ভাড়া দিয়াছি যাব কেন?" এই আর কি, বিবাদ মারামারি বাধিয়া গেল। রাজপথ দিয়া পথিক ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে চলিতেছে, পশ্চাতের দিক্ হইতে একটা গোরা তাঁহাকে লাথি মারিল। চা-বাগানের অধ্যক্ষ মহাশয় কোন কুলি-রমণীর ধর্ম্মনাশ করায় তাহার স্বামী ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিল, সাহেব তাহাকে প্রস্তরাঘাতে অসময়ে যমালয়ে পাঠাইলেন। কেহ মৃগয়া করিতে গিয়া পক্ষীজ্ঞানে চাসার প্রাণ নাশ করিতেন, কেহ বা পাঙ্খাকুলির প্লীহা ভাঙ্গিতেন। বিচারে তাঁহাদের সামান্য অর্থদণ্ড বা কারাবাস হইত। আসামী সাজা পাউক না পাউক, অনেক সময় ফরিয়াদীকে জেলে যাইতে হইত। ইহা দ্বারা ক্রমশঃ উভয় জাতির মধ্যে বিদ্বেষ প্রতিহিংসা ক্রোধ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। দুর্ব্বল হউক আর অসহায়ই হউক, অন্যায় অবিচার অত্যাচারে মানব মাত্রেরই মনের ভাব আপনাপনি বিকৃত বিষাক্ত হইয়া উঠে। সুযোগ ঘটিলে বাহিরে তাহার কাজও প্রকাশ হইয়া পড়ে। জবরদস্তিতে মানবহৃদয় কখন বশীভূত অনুগত হয় না।

বিধাতার কৃপায় এই দুঃসময়ে লর্ড রিপণের পৌত্র লর্ড উইলিয়াম্ উড্ সাহেব ভারতের রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসেন এবং জন্ ব্রাইটের নাতি সার আপরাইট সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণর হন। তদ্ব্যতীত মার্কুইস্ গড়্লীর সমকালিক কয়েক জন প্রাচীন রাজপুরুষ ব্যবস্থাপক সভা এবং অন্যান্য উচ্চ পদে কার্য্য করিতেন। দেশের লোকের মধ্যে বিশ্বম্ভর বাবু এবং মহারাজা সুচেৎ সিংহ বাহাদুর এবং আরও দুই চারি জন বড় লোক উভয় জাতির মধ্যে উল্লিখিত বিচ্ছেদ অসদ্ভাব দেখিয়া সর্ব্বদাই আপনা-আপনির মধ্যে দুঃখ প্রকাশ করিতেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বন্ধুভাবে ইহা

পুনঃ পুনঃ জানাইতেন। তচ্ছ্রবণে সহৃদয় ভদ্র ইংরাজেরা নিতান্ত আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "হায়! এখনও এই বিংশ শতাব্দীর শেষে ব্রিটিশ জাতির উপর এই সকল দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপিত হইতেছে? তবে কি প্রভুত্ব শক্তি পরম প্রভুর অধীনে পরিচালন করা অসম্ভব? আমাদের জাতীয় মহত্ত্ব গৌরব ধর্ম্মনীতিহীন জন কয়েক নীচ শ্রেণীর স্বার্থপর লোকের অত্যাচারে যে চিরকাল কলঙ্কিত হইবে ইহাত আর সহ্য করা যায় না। রাজ্যসুশাসনের জন্য যেমন নিরপেক্ষ ন্যায়সঙ্গত রাজবিধির প্রয়োজন, তেমনি বহুসংখ্যক উপযুক্ত সুবিচারক কর্ম্মকর্ত্তারও আবশ্যক। ভাল ভাল সচ্চরিত্র নেটিভ কর্ম্মচারীর সংখ্যা যাহাতে আরো বাড়ে তাহা আমাদের অগ্রেই করা উচিত।"

বড় লাট গুড্, যেমন ইহার নামটি, তেমনি স্বভাব। নাই বা হবে কেন? কত বড় লোকের বংশ! তিনি প্রথমে এ দেশে আসিয়া যখন ঐ সকল বিবাদ দুরাচারের কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ একবারে দুঃখ শোকে, লজ্জা অনুতাপে এবং ধর্ম্মক্রোধে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি এক দিন শোকভরে বাষ্পাকুল কণ্ঠে ব্যবস্থাপক সভায় বসিয়া স্পষ্টই বলিলেন;—(যদিও এটা নিয়মবিরুদ্ধ) "হায়! আমি এখানে কেন আসিলাম! মহাপ্রভু যিশুর উপদেশ বাক্য সকল আমি কেমন করিয়া রক্ষা করিব! এখানে ধর্ম্ম বজায় রাখা ত বড় সোজা কথা নয়। এক ইল্‌বার্ট বিলের জন্য আমার ধর্ম্মাত্মা স্বর্গীয় পিতামহ দেবকে কতই না লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল! যাহা হউক, ভগবান যদি আনিয়াছেন, এবং গুরুতর কার্য্যভার দিয়াছেন, তবে যতদূর আমি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে পারি তাহাই করিব। প্রকৃতি-পুঞ্জের হৃদয় যদি অধিকৃত না হয়, তাহা হইলে বৃথাই আমাদের শাসনগৌরব, অসার আমাদের জ্ঞান সভ্যতা। এমন ভাবে চলিব যাহাতে প্রজাদিগের হৃদয় হইতে স্বতঃই রাজভক্তি উথলিয়া পড়িবে। ঈশ্বর আমার সহায় হউন!"

বঙ্গের ছোট লাট আপ্‌রাইটও এ সম্বন্ধে বড় সার কথা কয়টী বলিয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন, "একি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে হাজার হাজার বৎসরের জ্ঞান সভ্যতা খ্রিষ্টিয়ান সুনীতির শাসন অতিক্রম করিয়া ব্রিটিশ জাতি এই ভারতে অদ্যাপি পশুবৎ আচরণ করিতেছে! হায় পরম প্রেমিক প্রভু যিশু, প্রেরিত পুল এবং গত দুই সহস্র বৎসরের শত শত খ্রিষ্টিয়ান সাধু মহাত্মাদিগের সুদৃষ্টান্ত, সুশিক্ষায় আমরা ভাল হইতে পারিলাম না! কত বিষয়ে কত বিদ্যা ক্ষমতা বাড়িল, উন্নতি হইল,

কিন্তু এগুলো ইণ্ডিযানচরিত্রের ধনলালসা বিষয়াসক্তি মোহ অহঙ্কার ইত্যাদি নৈতিক দৌর্ব্বল্য ঘুচিল না! পৃথিবীতে আর মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করে না। দুই তিন শত বৎসর ধরিয়া ভারতের হৃদয়শোণিত শোষণ করিয়া আমরা আপনাদিগকে হৃষ্ট পুষ্ট করিলাম, তথাপি আশা নিবৃত্ত হইল না, প্রজাপুঞ্জের সুখ শান্তি মঙ্গল বিধান কবিতে পারিলাম না। জ্ঞান বিজ্ঞান নীতি ধর্ম্ম সভ্যতার যদি এই পবিণাম হয়, তবে আব সে সকলে কাজ নাই। যে সভ্যতায় মানুষ জাতিনির্ব্বিশেষে পবস্পবেব ভাই বন্ধু আত্মীয় সুহৃদ এক পবিবার না হইতে পাবে তাহা লইয়া আমরা কি করিব? একটা বাঁদরেব সঙ্গে একটা কুকুব যদি একসঙ্গে কিছু কাল থাকে, তাদেব মধ্যেও সখ্য ভাব হয; আব এই আড়াই শ তিন শ বৎসব হইতে চলিল, তত্রাপি ইংবাজেব সঙ্গে নেটিভের ভ্রাতৃভাব হইল না। এ কি বাস্তবিকই তবে খেঁকশেযালীর সঙ্গে নেক্‌ড়ে বাঘেব সম্বন্ধ? ছি ছি ছি বড় ঘৃণার কথা! পবকালে মহাবিচারেব দিনে দেববাজ যিশুব নিকট কি বলিয়া আমবা জবাবদিহি কবিব তাহা ভাবিলে আব কূল কিনাবা দেখিতে পাই না! দুই দিনেব জন্য ভবে আসিযা অসাব পার্থিব ধন মানেব লোভে হায়! আমবা পরকাল অনন্তজীবন হাবাইলাম। সকলকেইত এক দিন মরিতে হইবে। একটী হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ ধনী স্বার্থপব বিষযাসক্ত বিলাসী গর্ব্বিত জনবুলের জাতি প্রস্তুত কবিলে তাহা হইতে পুরুষানুক্রমে সেইরূপ জাতীয় জীবন-স্রোতই প্রবাহিত হইতে থাকিবে, কিন্তু ইহাতে পুরুষার্থ কি আছে? প্রকৃত খ্রীষ্টিযান জাতি তবে কি আব হবে না? এ সকল নীচতা জঘন্য স্বার্থপবতা দেখিযা কেবল ফকিবী লইযা বনে যাইতেই ইচ্ছা হয। হায় ভগবান্ এত কাল পবে এ কি হইল? মাতঃ বসুন্ধবে! তুমি দ্বিধা হও, আমরা তোমার মধ্যে প্রবেশ কবিযা অনন্ত শান্তি লাভ কবি।”

ইংরাজের মুখে এরূপ আর্য্যগুণসম্পন্ন উচ্চ বৈবাগ্যেব কথা আমরা কখন কোন কালে শুনি নাই। উভয জাতিব হৃদযমূলে যে এক আর্য্যশোণিত বহিতেছে ইহা তাহাবই অকাট্য প্রমাণ। অথবা ভগবানেব কৃপায সকলই সম্ভব হয। মহা অসুরকেও তিনি ভক্ত কবিতে পাবেন। উনবিংশ শকের লোকেরা এ সব কথা শুনিলে হয়ত ইহা উপন্যাসেব গল্প কিম্বা পাগলের প্রলাপ বলিযা হাসিযা উড়াইযা দিত। কিন্তু একবিংশ শকেব যুবকেরা স্বচক্ষে ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিতেছেন, আমাব লিপি বাহুল্য।

যাঁহারা সৎকর্ম্মে নিরাশ হয় না, জীবগণের হিতের জন্য সরল অন্তঃকরণে ভাবে, চক্ষের জল ফেলে, দুইটা নিরপেক্ষ দয়ার কথা বলে, স্বয়ং ভগবান্ চিরকাল তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। এতগুলি মহাত্মা ব্যক্তির সদিচ্ছা সৎসঙ্কল্প কি নিষ্ফল হইতে পারে? অচিরে ঈশ্বরকৃপায় তাঁহাদের সাধু চেষ্টার ফল ফলিল। সুবিজ্ঞ বিচক্ষণ লর্ড গুড বিচার করিয়া দেখিলেন, কেবল পার্থিব ভোগ বিলাস সুখ ঐশ্বর্য্যের অভাব পূরণে প্রজা পালন হয় না, তাহাতে গর্দ্দভ দেহেরই ক্ষুধা, প্রবৃত্তিনিচয়ের পিপাসা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কোন কালে তাহা নিবারিত হইবার নহে। নৈতিক চরিত্র গঠন সকল মঙ্গলের নিদান।

সুনীতি সাধু গুণের বিকাশ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্তের পর প্রথমে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভাকে তাড়া দিলেন। পুনর্বায় যাহাতে মাথাফোলা এবং উদরশুষ্কতা রোগ না জন্মে, তন্নিবারণার্থ যেমন পূর্ব্বে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তেমনি অর্থকরী জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ছাত্রদিগের কোমল হৃদয়ে ধর্ম্মভয়, ঈশ্বরভক্তি, সত্যপ্রিয়তা, ন্যায় দয়া এবং সদাচার সুনীতির বীজ অঙ্কুরিত হয় তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষের পেষণে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সংশোধনার্থ তাঁহারা বাধ্য হইলেন। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃত্ব পদ কোন নাস্তিক অবিশ্বাসীকে দেওয়া হইবে না, প্রথমেই এই হুকুম বাহির হইল। জ্ঞানময়কে ছাড়িয়া জ্ঞানোপার্জ্জন? কি বিড়ম্বনা! এ জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনেক ভুগিতে হইয়াছে কি না, কাজেই তাঁহারা অনেক ধার্ম্মিক হরিভক্ত লোককে ঐ পদ প্রদান করিলেন। আর একটী সৌভাগ্যের সমাচার এই যে, সুচেত সিংহ এবং বিশ্বগুরের যত্নে কতিপয় সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ইহার কিছু পূর্ব্বে শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারের জন্য একটী সভা করেন। সেখান হইতে ভাল ভাল উৎকৃষ্ট সারগর্ভ প্রস্তাব সকল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইত। ছোট লাট আপ্‌রাইট এ সভার বড় পক্ষপাতী ছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মনিরপেক্ষতা মত প্রচলিত থাকাতে বিস্তর অনিষ্ট সংঘটিত হয়, বোধ করি অনেকে তাহা অবগত আছেন। নিরপেক্ষতার নামে প্রকারান্তরে ছাত্রদিগকে নাস্তিকতা অবিশ্বাস অনীতি শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহাতে ক্রমে ছাত্রবৃন্দ এবং শিক্ষিত যুবার দল অত্যন্ত উদ্ধত রাজভক্তিহীন অবাধ্য

এবং অকালপক্ক হইয়া উঠে। শিক্ষক এবং রাজপুরুষদিগকে মান্য করাত দূরের কথা, ইহারা পিতা মাতা গুরুজনকেও মানিত না। বিদ্যালয়, কার্য্যালয়, সমাজ, পরিবার, প্রত্যেকের জীবনে ইহার বিষময় ফলে ভয়ানক অশান্তি বিস্তার হয়। এই জন্য যাহাতে গোড়া পত্তন ভাল হয়, কর্ত্তৃপক্ষ তদ্বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইলেন।

কিন্তু এ সমস্যাটী বড় সহজ নয়। নীতি শিখাবে কে? আগে আগে সাহেবেরা বলিতেন, "উচ্চ উচ্চ পদ, শাসন কর্ত্তৃত্বের ভার কাহাকে দিব? সৎসাহসী নীতিবান্ লোক কোথা?" কলেজ স্কুলে নাস্তিক বিদ্বান্ প্রস্তুত করিয়া দিয়া এরূপ বলা এক প্রকার উপহাস করা। অধীন প্রজার প্রাণে সকলি সয়। মুখে এই বলিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতেন, কাজে কিছু করিতে পারিতেন না। অনেক চেষ্টার পর শেষ এক নির্দ্ধারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেন। তদনন্তর কেহ হয়তো দুই একটা বক্তৃতা করিলেন, কেহবা নীতিশাস্ত্র রচনা করিলেন, ঐ পর্য্যন্ত।

এক্ষণে নীতিশিক্ষার জন্য প্রথমতঃ সচ্চরিত্র শিক্ষকের বড় প্রয়োজন হইয়া পড়িল। নীতিনর্ম্ম্যাল বিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক নীতিশিক্ষক প্রস্তুত করিতে হইবে এই নবীন অনুজ্ঞা তখন বাহির হইল। কিন্তু শিক্ষকদিগকে শিখাবে কে? মহা বিপদের কথা। নাস্তিক অবিশ্বাসী দ্বারা এ কার্য্য হইবার নয়, আবার গোঁড়া কুসংস্কারান্ধ ধার্ম্মিকেরও কাজ নয়; যিনি ইয়োরোপের আধুনিক নীতিবিজ্ঞান পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছেন তাঁরও কর্ম্ম নয়, তবে এখন উপায়? অনেক চিন্তা আন্দোলনের পর লর্ড গুড্ বলিলেন, "বিশ্বম্ভর বাবুর উপর ইহার ভার দেওয়া হউক; তিনি যাহা ভাল বুঝেন তাই করুন।"

তৎকালে স্বভাবের বিদ্যালয়ে শ্রীমৎ ভগবান পণ্ডিতের নিকট যে কয় জন ছাত্র নীতিশিক্ষা পাইয়াছিলেন তাঁহাদের হস্তে এই ভার ন্যস্ত হইল।

বিশ্বম্ভর এবং তদীয় সহচরগণ এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন। ইহারাই নীতিনর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রথম শিক্ষক হন, এবং ইহাদের দ্বারা ক্রমে নীতিশিক্ষক প্রস্তুত হইল। তদনন্তর ভাল চাকরী, পুরস্কার এবং পদমর্য্যাদার লোভে অনেকে এই কার্য্যে নাম লেখাইল। অন্যান্য শিক্ষক অপেক্ষা নীতিশিক্ষকদিগের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ অর্থ সম্বন্ধে কিছু বিশেষ বিবেচনাও করিলেন। সুতরাং নীতিহীন বড় বড় বিদ্বান শিক্ষক অধ্যাপক-

দিগের উপর কিছু চাপ পড়িল। তাঁহারা তখন ভাবিতে লাগিলেন, "আমরা এইরূপ অপদস্থ হইয়া থাকিব, কি দুষ্কর্ম্ম কুদৃষ্টান্ত অনীতি অধর্ম্ম সুরাপান ছাড়িয়া নীতিনর্ম্ম্যালের সার্টিফিকট লইবার চেষ্টা করিব ?" যাঁহারা পুরাতন পাতকী তাঁহাদের মতি গতি ফিরিল না, কেবল বিদ্যা উপাধি বলে বড় হইব বলিয়া তাঁহারা অহঙ্কারে মত্ত রহিলেন। যাঁহাদের স্বভাব বেশী পাকে নাই তাঁহারা অনেকে এই উপলক্ষে ভাল হইয়া গেলেন। নীতিশিক্ষা দান কেবল ত বিদ্যায় হয় না, চরিত্র ভাল হওয়া চাই, সুতরাং পদের অনুরোধে অনেকে সচ্চরিত্র সত্যবাদী সরল সাধু হইলেন। লোভে ভয়ে পাঁচ রকমে যখন শিক্ষকের দল সচ্চরিত্র হইল, তখন ছাত্রেরা যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে দলে দলে এই পথে আসিতে লাগিল। অবশ্য ইহাতে গবর্ণমেন্টের আবগারি বিভাগের এবং ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের অনেক আয় কমিয়া গেল। কিন্তু এ সময় যে মহাত্মা রাজপ্রতিনিধির পদে ছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে মন্ত্রীসভায় যে কয় জন ধার্ম্মিক ন্যায়বান সভ্য ছিলেন, তাঁহাদের এবং বিশ্বম্ভর প্রভৃতির যত্নে দেশের অশেষ বিধ মঙ্গল সাধিত হইল, অন্য দিক দিয়া সে ক্ষতি পূরণ হইয়া গেল। এই সুশিক্ষার ফলে দেশীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, মোন্সেফ, পুলিশ কর্ম্মচারী এবং কাছারির আমলা, কেরাণী সকলেই সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণ হইতে বাধ্য হন।

নীতি শিক্ষা দ্বারা লোকের চরিত্র ভাল হইল কি না তাহার প্রমাণ কি? নীতি পুস্তক পড়িলেই লোকে সচ্চরিত্র হয় না। প্রকাশ্য স্থানে ভদ্রের সভায় শিষ্টাচার নম্রতা দেখাইলেই মানুষকে সাধু সজ্জন বলা যায় না। গুপ্ত চরিত্রে, পারিবারিক জীবনে, বিষয়ক্ষেত্রে, কার্য্যালয়ে ভৃত্য এবং অধীনবর্গের নিকট তাহার যথার্থ পরিচয়। এখানে যে নীতির উন্নতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার মানে বাহ্য ভদ্রতা সভ্যতা শিষ্টাচার নয়, বিবেকের চক্ষে, সর্ব্বসাক্ষী ভগবানের দৃষ্টিতে অনেক কৃতবিদ্য যুবক নির্দ্দোষ কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিলেন। বাহিরের ফল দ্বারাও তাঁহাদের সচ্চরিত্রতার প্রমাণ পাওয়া গেল। এইটী হইল বলিয়াই রক্ষা, নতুবা সর্ব্বনাশ ঘটিত।

এই নীতির উন্নতির প্রভাবে রাজা প্রজায় বন্ধুত্ব ভ্রাতৃভাব জন্মিল। তৎসঙ্গে পারিবারিক জগতে এবং সমাজমধ্যে তাবৎ বিষয়ে শান্তি কুশল পবিত্রতা বিস্তার হইল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এ দেশের মুখশ্রী এক

কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। অবশ্য ইহা লিখিতে এবং পড়িতে যে সময়ের আবশ্যক হয় কার্য্যফল ফলিতে তদপেক্ষা অনেক সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে প্রচুর ফল প্রসূত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত শুভ পরিবর্ত্তনের অনুমান দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যিশুর জন্মোৎসবের ছুটিতে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে জাতীয় মহাসমিতির সাম্বৎসরিক মহাসভা হয়, তাহাতে ভারতের সকল জাতীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ যোগ দান করেন। ইহাকে ঠিক সেই পুরাতন কংগ্রেস সভা বলা যায় না, তাহার পুনরুদ্ধার এবং নব বিকসিত ভাব। অনেকানেক উদার স্বভাব ইংরাজ সভাস্থলে ছিলেন। ব্রিটিশ পার্লেমেন্টের কতিপয় ভারতহিতৈষী সম্ভ্রান্ত সভ্য রাজপুরুষও দেশভ্রমণে আসিয়া সভার কার্য্যে যোগদান করেন। বাঙ্গালীরা সর্ব্বাপেক্ষা দলবলে বেশী, তন্মধ্যে বিশ্বম্ভর এবং মহারাজ সুচেত সিংহ প্রভৃতি জাতীয় সংস্কারকগণ প্রধান। গবর্ণমেন্টের যে সকল ইংরাজ ও দেশীয় কর্ম্মচারী রাজভক্তি এবং স্বাধীনতার সহিত এ সভার কার্য্যে যোগ দিতেন তাঁহারাও উপস্থিত আছেন। পূর্ব্বের ন্যায় এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের আর কোন নিষেধ বিধি নাই।

প্রমুক্ত প্রান্তরে প্রকাণ্ড বিস্তৃত এক পটগৃহে ভারতের নানাজাতীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহারাজা রাজা জমিদার সওদাগর ব্যক্তিগণ সভা আলো করিয়া বসিয়াছেন, যেন এক বিচিত্র কুসুমোদ্যানে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশীয় এবং ইয়োরোপীয় কতিপয় মহিলাও দর্শনার্থিনী হইয়া তন্মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় গবর্ণর রাইট্ অনারেবল সার ল্যাম্ব সভাপতি। লোহিত পরিচ্ছদধারী সার্জ্জন গোরা এবং শিখ পল্টন চারিদিকে দণ্ডায়মান। বড় বড় লাল নীল পীত নিশান সব উড়িতেছে। চারিধারে নহবৎ রসনচৌকি ইংরাজি ব্যাণ্ড বাজিতেছে। যেন এক রাজসূয় মহা যজ্ঞশালা। ধূপ ধূনা আতর গোলাপ এবং পুষ্পগন্ধে আকাশ প্লাবিত, তদুপরি সুমন্দ সুশীতল পশ্চিম সমীরণ বহিয়া যাইতেছে।

কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে সর্ব্বসম্মতিতে বিশ্বম্ভর বাবু বেদীর উপরে দণ্ডায়মান হইয়া করপুটে ভক্তিভরে প্রথমতঃ সর্ব্বজনবন্দনীয় বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার নিকট উদার এবং সুমিষ্ট ভাবে মৃদু গম্ভীর নাদে এই সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাটী করিলেন ;—"হে ব্রহ্মাণ্ডস্বামী, হে বিশ্বরাজ, তব রাজসিংহাসনতলে আসিয়া আমরা দাঁড়াইলাম। তুমি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি এবং স্বর্গীয় বল বিধান কর যেন তোমার একান্ত অধীন হইয়া তোমার ইঙ্গিতে জাতীয় শাসনকার্য্যে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি। তুমি জিত জেতা সকলকে একহৃদয় একপ্রাণ করিয়া দাও। দুঃখী ভারত হে দয়াময়, তোমার প্রসাদে আজ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছে। ইহাকে তুমি আরো আশীর্ব্বাদ কর।"

বিশ সহস্র লোক নিস্তব্ধ ভাবে উপবিষ্ট, একটু টুঁ শব্দ নাই। তাহার মধ্যে উচ্চ বেদীর উপর শান্তমূর্ত্তি সমুন্নত দিব্যদেহধারী প্রসন্নাত্মা বিশ্বম্ভর দণ্ডায়মান, অতীব সুন্দর দৃশ্য। প্রার্থনান্তে তিনি বিশুদ্ধ সুস্পষ্ট অথচ সহজ ইংরাজি ভাষায় বলিলেন, "সভাপতি এবং বন্ধুগণ! স্বদেশীয় বিদেশীয় ভ্রাতৃগণ! দেখ যথাসময়ে মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের প্রতি কেমন প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিতেছেন এবং আশীর্ব্বাদ করিতেছেন! আহা কি শুভ সময়ই উপস্থিত হইল! অল্পে অল্পে তাঁহার বিশ্ববিজয়িনী মঙ্গলেচ্ছা কেমন পূর্ণ হইতেছে! ভারতাকাশ পুনরায় আবার সৌভাগ্যরবির নব উষার আলোকে কেমন দীপ্তি পাইতে লাগিল। হোমাগ্নি-বিশোধিত পুণ্যময় আর্য্য ক্ষেত্রের যজ্ঞীয় ভস্মরাশি ভেদ করিয়া কল্যাণের কুসুম কলিকা সেই মধুর উষার অরুণ বর্ণে বিকসিত হইয়া কেমন হাসিতেছে! আর সে দুঃখ দারিদ্র্যের আর্ত্তনাদ নাই, অন্যায় রাজশাসনের উৎপীড়ন নাই। আর স্বজাতিহিংসাপরতন্ত্রতা, বিজাতিবিদ্বেষ বৈরিতাও নাই। সুপুত্র দেবরাজ ঈশার নাম ধন্য হউক! (বিশ সহস্র করতালি) সম্রাটকেশরী মহামান্য বৃদ্ধ আলবার্ট ভিক্টরের জয় হউক! (করতালি) ধন্য ব্রিটিশ জাতি! ইহার রাজশক্তি ঐশীশক্তি এবং ঈশাশক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডস্বামী যেখানে আপনার আদর্শপুত্র নরোত্তম যুবরাজ ঈশাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া প্রজা পালন করিতেছেন সেখানে আর সুখের রাজ্য শান্তির রাজ্য কেনই বা না প্রতিষ্ঠিত হইবে? এই ব্রিটিশ-শক্তির ভিতর তোমরা হ্যাট কোটপরা শ্বেতমূর্ত্তি ব্যতীত আর কি কিছু দেখিতে পাও? ইহা ষড়যন্ত্র বা জড়যন্ত্রের লীলা নহে। ব্রিটিশ শক্তির অভ্যন্তরে ভগবানের

অভিপ্রায় এবং লীলা দর্শন কর, অসার আবরণ দেখিয়া ভুলিও না। "আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকেও ধন্যবাদ! কেন না, তাঁহারা অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়াও এই জাতীয় মহাসমিতির ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহারা পরলোক হইতে তাঁহাদের নিঃস্বার্থ স্বদেশহিতৈষণার সুফল দর্শন করিয়া সুখী হউন। যাঁহারা কেবল ভগবানের অলৌকিক শক্তি এবং মঙ্গল সঙ্কল্পের উপর নির্ভর করিয়া এই জাতিসাধারণের হিতব্রতে জীবন সঁপিয়াছিলেন, তাহাদের পুণ্য ফলে আজ ভারত ধন্য হইল।

"ব্রিটিশ রাজ্যের কর্তৃত্বে এবং দেশীয় প্রজাগণের সাহায্যে দেখ জিত জেতা উভয়ে ভ্রাতৃপ্রণয়ে বন্ধুভাবে মিলিয়া কেমন এখন কার্য্য করিতেছেন! ব্যবস্থাপক সভার অর্দ্ধেক সভ্য ভারতসন্তান, অথচ সে জন্য শাসন-কার্য্যের কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। কেনই বা ঘটিবে? ন্যায় নীতি দয়া ধর্ম্ম যেখানে পরিচালক সেখানে পশুবল, বুদ্ধিকৌশল, হস্তসমষ্টির বল কি কখন প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে? বিভাগীয় এবং উচ্চতম বিচারালয়ের উচ্চ পদে দেশীয় সিভিলিয়ান শত শত। উভয় জাতি মিলিয়া অন্তর্জাতীয় বাণিজ্য কার্য্য করিতেছেন তাহাতে উভয়েই সুখী। গ্রেট ব্রিটনের শিল্প সাহিত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন আমরা সম্পদশালী। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে কলেজ স্কুল নীতিবিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম, দরিদ্রভবন, পান্থশালা, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ; জলে ষ্টীমার, স্থলে রেলপথ ট্রামওয়ে। চুরি ডাকাতি উঠিয়া গিয়াছে, স্বাস্থ্য রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বিত হইতেছে। বাণিজ্য ব্যবসায়ের দ্বার সর্ব্বত্র উন্মুক্ত। ছোট বড় ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ এক রাজবিধি দ্বারা সমভাবে নিয়মিত। ইংরাজের সাহায্যে দেশীয় শিল্প সাহিত্য সুনীতি সদাচার এবং ধর্ম্মেরও উন্নতি হইল। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই মঙ্গলের চিহ্ন দেখিতে পাই। যথা-যোগ্য পাত্রে গুণানুসারে উপযুক্ত পদ প্রদত্ত হইতেছে, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের বিচার নাই। ইয়োরোপের গৌরাঙ্গী মহিলাগণ এ দেশের হিন্দু মুসলমানের গৃহলক্ষ্মী এবং দেশের কন্যাগণ বিদেশীয় সম্ভ্রান্তগৃহে বিবাহিত হইতেছেন। উভয় জাতি উভয়ের সদগুণরাশি সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক এক পরিবারের ন্যায় বাস করিতেছেন।

"এই বিদেশীয় সভ্যতা এবং রাজশাসনের প্রভাবে আমাদের যাহা

পুরাতন গৌরব, পৈতৃক সম্পদ ছিল তাহাও আমরা এখন ভোগ করিতেছি। ঘৃণিত জাতিভেদ প্রথা এবং ভ্রান্তি কুসংস্কার জ্ঞান সভ্যতার আলোক দর্শনে ক্রমে তীরোহিত হইতেছে। আমরা ভারতের সকল জাতিকে এক ভ্রাতৃপ্রেমালিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছি। (করতালি) এক ভাষায় কথা কহিতেছি। নানা বিষয়ে মতভেদ ধর্ম্মভেদ সত্বেও দেখ! আজ আমরা মাতৃভূমির হিতের জন্য এক উদার প্রেমে সম্মিলিত। আমরা এক ঈশ্বরের সন্তান এক ভ্রাতৃমণ্ডলী। (করতালি) কিসের মতভেদ! প্রতি জনের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ কতকগুলি স্থানীয় জাতীয় সাময়িক বাহ্যিক বিষয়ে মতভেদ আছে তাহাত মঙ্গলেরই জন্য। এমন পাষণ্ড কে আছে যে সে জন্য সর্ব্বমূলাধার ভগবানকে ভক্তি করিবে না? এমন স্বার্থপর পশুইবা কে আছে যে মনুষ্যমাত্রকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে ভালবাসিবে না? আহা আজ আমরা সকলেই একমায়ের ছেলে হইয়া কেমন ভ্রাতৃপ্রেম সম্ভোগ করিতেছি! (দরদরিত ধারে নয়নাশ্রু বর্ষণ) দেশের পূর্ব্বতন ধর্ম্মসংস্কারক এবং সমাজ-সংস্কারকগণ আজ আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, আর মহানন্দে অমর ধামে বসিয়া জগদীশ্বরের যশোগীত গাইতেছেন। তাঁহাদের হৃদয়ের পবিত্র আশা, উচ্চ লক্ষ্য এক্ষণে পূর্ণ হইতে চলিল, ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে! আজ আমরা তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে বার বার প্রণিপাত করি। আহা! এত দিনে পূর্ব্বতন সাধু মহাত্মারা ধন্য হইলেন। জয় বিশ্বাসী ভক্তবৃন্দের জয়! (করতালি)

"কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ! এ সব মঙ্গলকার্য্য কে করিল? কাহার গুণে ভারত সমাজে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইল? তোমার আমার গুণে নহে। ইংরাজ বা দেশীয় প্রজাবর্গের গুণেও নহে। সেই অনন্ত গুণাকর প্রজাপতি ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মে। এখন কি সেই অসহায় অন্নহীন কৃষক শ্রমজীবীর প্রাণনাশকারী অসুরবৎ ইংরাজাধমদিগের প্রেতাত্মাগণ পুনরায় আবার ফিরিয়া আসিবে? বর্ত্তমান বংশের সদাশয় ভদ্ররাজপুরুষদিগের প্রদত্ত সদ্ব্যবহাররূপ পিণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা পরলোকে সদ্গতি লাভ করুক! যাহারা স্বার্থ সাধনের জন্য নীচ ভাবে স্বদেশের বিরুদ্ধে বিজাতির পদ লেহন করিত, স্বজাতীয় স্বদেশস্থ ভাইকে পর ভাবিয়া কষ্ট দিত, এবং গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া হীনমতি অহঙ্কারী রাজপুরুষ বিশেষের প্রশংসা গাইত; আবার নিজের মতলব সিদ্ধ না হইলে অমনি যাহারা দেশহিতৈষী হইয়া গবর্ণ-

মেণ্টকে নিন্দা করিত, তাহারাই বা এখন কোথায়? তাহাদের লজ্জিত মুখ এখন কালের অন্ধকার আবরণে লুক্কায়িত হইয়াছে। হায়! হায়! গর্ব্বিত স্বার্থপর লোভী নরপিশাচগণ! আজ তোমাদের কি দুর্দ্দশাই দেখিতেছি! কেহ আর তোমাদের নামও করে না। তোমাদের এরূপ শোচনীয় পরিণাম হইবে আগে যদি জানিতে, তাহা হইলে কি নীচ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া তেমন নৃশংস কাজ করিতে পারিতে? তোমাদের প্রেতাত্মাগণ এখন অন্ধকারে পড়িয়া কাঁদিতেছে। তোমাদের অকীর্ত্তি সকল তোমাদের নামের সঙ্গে সঙ্গে কাল-স্রোতে এমনি ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে যে আর তাহার চিহ্ন মাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। কেন তবে হায় ঈদৃশ কুমতি তোমাদের হইয়াছিল। তোমরা না জন্মিলে ভাল হইত। সাবধান বর্ত্তমান বংশ। সেরূপ যেন তোমাদের মতি গতি না হয়। তাহারা যে স্বার্থের জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিল তাহাই বা এখন কোথা, আর তাহারাই বা কোথা? পার্লেমেণ্টের সে সকল বচন-সর্ব্বস্ব কপট সভ্যগণই বা কোথায় যাঁহারা বচনে লিখনে গগন ফাটাইয়া বলিতেন, "ভারতবর্ষ ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বারা শাসিত হইবে" অথচ কার্য্য-কালে সিকি পয়সারও উপকার করিতেন না? এ দেশের কোন বিষয় মহাসভায় উপস্থিত হইলে যাঁহাদের চক্ষে ঘুম আসিত এবং যাঁহারা উঠিয়া যাইতেন, কিম্বা অনুপস্থিত থাকিতেন, তাঁহারাও এখন মৃত্তিকার তলে চির-নিদ্রায় আচ্ছন্ন, পঞ্চভূতে বিলীন। আর কি তাঁহাদের দগ্ধমুখ দেখিতে হইবে? কখন না। কখন না। (করতালি) ধন্য ইংলণ্ড! ধন্য ভারতবর্ষ! এখন দুইয়ের মধ্যে প্রেমের মিলন। ইংরাজকর্ত্তৃপক্ষও লোভ স্বার্থ এবং অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া ভারতের প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার অবিচার ঘৃণা করিবেন না, প্রজারাও রাজজাতির প্রতিহিংসা বা অকৃতজ্ঞতা অশ্রদ্ধা পোষণ করিবেন না। জ্যেষ্ঠের সহিত কনিষ্ঠের যেরূপ মিষ্ট সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া চলিবেন। আমরা এখন প্রজা এবং রাজা দুইই হইয়াছি। জিত এবং জেতার মধ্যে যে বিদ্বেষ ভাব ছিল তাহা উঠিয়া গেল। কে এমন নরাধম পাষণ্ড আছে যে, আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পুনরায় সেই পূর্ব্ব শতাব্দীর অসভ্য শাসনপ্রণালী নীচ স্বার্থপরতা, অন্যায় অত্যাচার স্বজাতিপক্ষপাতিতা এবং বিজাতি-বিদ্বিষ্ট ভাবকে পুনরায় জাগ্রত করিবে? ধিক! তাহাকে যে ইহা মনেও স্থান দিতে পারে। ভদ্রবংশে জন্মিয়া, সুশিক্ষা লাভ করিয়া, রাজ্যের

উচ্চ পদে অভিষিক্ত হইয়া যাহারা নিরাশ্রয় দুর্ব্বল শরণাগত প্রজাদিগকে কুকুর শেয়ালের মত জ্ঞান করে, ঘুষি মারে, ঘৃণার চক্ষে দেখে তাহারা পূর্ব্ব শতাব্দীর ভীরু কাপুরুষ; বর্ত্তমান শতাব্দীতে কোন্ লজ্জায় তাহারা আর মুখ দেখাইবে? এই দেখ। "মহামিলন" পতাকা ধারণ করিয়া আমি এই প্রাচীন ভারতের পুণ্যভূমিতে দণ্ডায়মান হইলাম!"

এই বলিয়া মহাবীর বিশ্বম্ভর স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত সেই দেবদত্ত অপূর্ব্ব পতাকা ঊর্দ্ধে ধারণপূর্ব্বক সভাবেদীর উপরে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তাঁহার তেজোময়ী বাগ্মিতাপ্রভাবে সভাস্থ সকলে দাঁড়াইয়া—"জয় মিলনকারী ঈশ্বরের জয়!" শব্দ উচ্চারণ করিল, চারিদিকে মঙ্গলবাদ্য বাজিল, পুষ্পবৃষ্টি হইল। তৎকালে বক্তার দুই চক্ষে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছিল। তাঁহার এক একটী কথা যেন বজ্রনিনাদে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছিল। কি সাহস! কি বিশাল উদ্যম! তিনি যেন রাজরাজেশ্বরের রাজপ্রতিনিধি। দেখিয়া শুনিয়া বড় বড় ইংরাজ রাজপুরুষেরা একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

তদনন্তর বিশ্বম্ভর মহাপ্রেমে মত্ত হইয়া পুনর্ব্বার সিংহনাদে বলিলেন, "ইহা স্বর্গরাজ্যের প্রতিচ্ছায়া। আদর্শ প্রেমপরিবার। ইহাই ধরাতলে সকলে দেখিতে চায়। বিবাদ, বিদ্বেষ কেহ দেখিতে ইচ্ছা করে না। ভগবান বিশ্বপতির সৃষ্টিলীলার ইহাই চরমোদ্দেশ্য। জননীগর্ভে জন্মিয়া কে এমন ব্যক্তি পৃথিবীতে আছে যে বলিবে, "কেবল মাত্র স্বজাতির সুখ সম্পদ বৃদ্ধি এবং স্বার্থসাধনই রাজকার্য্যের লক্ষ্য?" দেখ আজ কেমন আনন্দ। কেমন ভ্রাতৃমিলন! কেমন জাতীয় মহোৎসব। কেমন উদার প্রেমের রাজধর্ম্ম! ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের মঙ্গল সঙ্কল্পের প্রতিকূলে কে আর কত দিন দাঁড়াইয়া থাকিবে? আর কেহ ভ্রাতৃবিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিও না। ন্যায়বান ঈশ্বরের রাজ্য সমাগত হইল। রাজভক্তি সহকারে তাঁহার শরণাপন্ন হও!"

বক্তার অগ্নিময় বচনে এবং মুখকান্তির দিব্য জ্যোতি দর্শনে শ্রোতৃ-মণ্ডলী মোহিত হইলেন। আমরা ইংরাজি বক্তৃতার প্রকৃত ভাব এবং ওজস্বিতা অনুবাদ করিয়া উঠিতে পারিলাম না এই বড় ক্ষোভের বিষয়। যাহারা বিরোধী অল্পমতি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, প্রজাতন্ত্র বা প্রধানতন্ত্রের লোক ছিল, যাহারা কেবল ফলাফল বিচার ভিন্ন আর কিছুই জানিত না, তাহারা বিশ্বাসী বিশ্বম্ভরের বিশ্বাসভক্তিপূর্ণ সত্যগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, যে

বিধাতা স্বয়ং এই মহামিলনের কার্য্য সাধনপূর্ব্বক স্বর্গের ছবি, আদর্শ গবর্ণমেণ্টের ছবি পৃথিবীতে দেখাইলেন।

মহাভাগ বিশ্বম্ভরের প্রশান্ত মুখশ্রী, স্বদেশানুরাগস্ফুরিত নয়নজ্যোতি এবং জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিভা শক্তি; তদীয় উৎসাহকর নিরপেক্ষ বচনাবলী এবং হস্তস্থিত জয়নিশান শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণে যেন তড়িতপ্রভা সঞ্চার করিল। তখন পার্লেমেণ্টের সভ্য লর্ড ব্রডহার্ট সিংহের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতি বিনীত গম্ভীর ভাবে ছল ছল নেত্রে গদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ। আমি আজ সমস্ত ভারতের প্রতিনিধিগণ-সম্মুখে ইংরাজ জাতির প্রতিনিধিরূপে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-গণের কৃত পাপ অত্যাচারের জন্য অনুতাপ করিতেছি। অঙ্গে ভস্ম মাখিয়া এবং গলে ছিন্ন কন্থা বাঁধিয়া প্রকাশ্যরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। আপনারা এবং আপনাদের পরলোকবাসী পিতৃপুরুষগণ আমাদিগকে ক্ষমা করুন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শতাব্দীর এঙ্গলোইণ্ডিয়ানদিগের কৃত অপরাধ কলঙ্ক আমার মস্তকে আসিয়া উপস্থিত হউক! আহা আমরা তোমাদিগকে পৈতৃক ধনে, ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকার হইতে কত কাল পর্য্যন্ত বঞ্চিত রাখিয়াছিলাম! অকারণে অহংমদে মাতিয়া ভ্রাতৃবধের মহাপাপেও পাতকী হইয়াছি। কোথায় নাবালক শিশু তুল্য এই ভারতীয় প্রজাকুলের রক্ষক অভিভাবক হিতৈষীর পদে বরণ করিয়া প্রজাপতি ভগবান আমাদিগকে এখানে পাঠাইলেন, আর আমরা কি না, যেমন অনাথ সন্তান এবং বিধবার সম্পত্তি লোকে হরণ করে, তদ্রূপ তোমাদের মাতৃভূমির সর্ব্বস্ব হস্তগত করিয়া তোমাদিগকে কুক্কুরবৎ এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারের ভিখারী করিয়া রাখিয়াছি! গচ্ছিত ধন ইষ্ট সম্পত্তি আত্মসাৎ করার তুল্য আর মহাপাপ ত্রিজগতে নাই।

"এজন্য আমি গবর্ণমেণ্টের দোষ দিতে পারি না। এ সব গবর্ণর এবং কর্ম্মচারীদের দোষ। হায়। মনে হইলে আর চক্ষে জল রাখা যায় না। কত মানীর মান, ধনীর ধন, বিধবার মুখের অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইয়াছি। অহো! নরহত্যা শোণিতপাত পর্য্যন্ত। ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুরীকে বালকেরা যেমন খাদ্য বস্তু দেখাইয়া, লোভ উদ্দীপন করতঃ পরে আপনি তাহা খাইয়া ফেলে এবং তাহাকে পদাঘাতে বিদায় করিয়া দেয়, আর্য্যসন্তানগণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক তদ্রূপ অপমানিত হইয়াছিল। না জানি

তাহাঁদের দোষে কত কত দুঃখিনী বিধবা, পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকা, অন্তঃপুরনিবদ্ধা শোকসন্তপ্তা সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহিলা, কত রাজা, রাজপুত্র অন্নাচ্ছাদন অভাবে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইযাছে!"

এই কথা বলিতে বলিতে লর্ড ব্রডহাটের দুই চক্ষে ঝর ঝর করিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল, মুখ গণ্ডস্থল তুষার সদৃশ শ্বেতবর্ণ হইল। যখন সেই প্রশস্তহৃদয় সমুন্নতস্কন্ধ দীর্ঘদেহ বীরপুরুষ সভাস্থলে এই হৃদয়ভেদী অনুতাপ বচন বিন্যাস করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন, তখন সমস্ত লোক হা হা শব্দে ব্যাকুল হইযা কাঁদিযা উঠিল এবং আকুল কণ্ঠে চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিল, "আপনি বসুন। আপনি বসুন। যথেষ্ট হইয়াছে, আর খেদ প্রকাশ করিবেন না।" একটী পাঞ্জাবী শ্রোতা উচ্ছ্বসিত ভাবোল্লাসে বিবশ হইযা তাঁহার পা জড়াইয়া হাউ হাউ করিযা কাঁদিতে লাগিল। এবং ব্যাকুল হৃদযে বলিল, "ক্ষান্ত হউন। আর আমরা আপনার ক্রন্দন সহ্য করিতে পারিব না, ক্ষান্ত হউন।"

ভারতের আর কোন গুণ ক্ষমতা থাক বা না থাক তাহার হৃদয় বড় কোমল, অল্পেই গলিযা যায়। পণ্ডিত নির্ব্বাণানন্দ ত্রিবেদী উঠিয়া বলিলেন, "সে জন্য এখন আমাদের আর কোন দুঃখ নাই। ক্ষমা ত অতি সামান্য কথা, হে সদাশয় পুরুষ, আপনার অনুতাপ বিলাপ দর্শনে আমরা বড় ব্যথিত এবং কুণ্ঠিত হইতেছি। আপনি এক্ষণে বিগতশোক হউন। শান্তি লাভ করুন। অপরাধীর অনুতাপ আমাদের অসহ্য। আর্য্যবংশীয়েরা প্রতিহিংসা পোষণ করেন না। পৃথিবীর কোন গবর্ণমেণ্টই যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয় তাহাও তাঁহারা অবগত আছেন। বিশ কোটী বিভিন্ন জাতীয় প্রজাকে সন্তুষ্ট করা কি সহজ কথা? ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে শত ধন্যবাদ যে তাঁহারা এই পতিত ভারতকে এত দূর ভাল করিযা তুলিযাছেন। সহস্র অত্যাচার করিলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব শতাব্দীর শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি। অদ্যকার শুভ দিনে তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ করি। (করতালি) যাহা কিছু দুর্ঘটনা ইতঃপূর্ব্বে ঘটিযাছে তাহা বিধিলিপি; অদৃষ্টের কর্ম্মফল। কেহ কাহাকেও মারেও না, কেহ মরেও না। শত্রুও কেহ কাহারও নয। মানুষ আপনিই আপনার শত্রু এবং মিত্র। জগৎ ব্রহ্মময, ইহার ধ্বংস নাই। পার্থিব ধন মান সুখ বিলাস অতি হেয ও অসার।"

ব্রডহার্ট পুনর্ব্বার খেদ করিয়া বলিলেন, "আমি এই জন্য আরও দুঃখিত হইতেছি যে আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষেরা এখন কোথায়? কাহার জন্য এ দেশ হইতে ধনরাশি তাঁহারা লইয়া গিয়াছিলেন? এখন সে সকল লোকই বা কোথায়, আর ভারত ইংলণ্ডই বা কোথায়? আহা কিসের জন্য এ সব ঘোরতর পাপানুষ্ঠান বল দেখি। হায়, আমার এই দেহ সেই পাপধনে বর্দ্ধিত এবং পরিপুষ্ট হইয়াছে। এ কলঙ্কিত শরীর আমার এই দণ্ডেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক! অদ্য আমি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেছি, আমার পিতামহ সার হেনেরি পামর কর্ত্তৃক এ দেশ হইতে যে ধন সম্পত্তি উপার্জ্জিত হইয়াছিল এবং এক্ষণে একমাত্র আমিই যাহার উত্তরাধিকারী, তৎসমুদায় এই সভায় আমি উৎসর্গ করিলাম। অনাথ দরিদ্রদিগের সেবায় যেন তাহা ব্যয়িত হয়। তাহার এক কপর্দ্দকও আর আমি ব্যবহার করিব না। আমি শুনিয়াছি তাহার অধিকাংশ ধন অন্যায়রূপে উপার্জ্জিত। অদ্য হইতে আমি শারীরিক পরিশ্রমে ভারতের সেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।" এই বলিয়া তিনি বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরী এবং সোণার ঘড়ি চেনশুদ্ধ বেদীর উপর ফেলিয়া দিলেন।

সভাস্থ লোক সকল দেখিয়া শুনিয়া একবারে অবাক্ স্তম্ভিত হইল। করতালি এবং হরিধ্বনিতে আকাশ কাঁপিল। তখন কেহ বলেন, "ধর্ম্মের কি বিচিত্র গতি!" কেহ বলেন, "ইনি যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির।" কেহ বলেন, "আহা ইংরাজ জাতির হৃদয় কি প্রশস্ত!" বস্তুতঃ ব্রডহার্টের হৃদয়টী অতি কোমল। তাঁহার পিতামহ এক সময় এ দেশে কোন এক স্বাধীন রাজ্যের রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি অনেক টাকা মোহর হীরা মণি সোণা পান্না জহরৎ উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যান, তদ্ব্যতীত দেশে যাইবার কালে এ দেশ হইতে একটী স্ত্রীরত্নও লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার গর্ভস্থ সন্তানের ঔরসজাত পুত্র এই মহোদয় ব্রডহার্ট। এই জন্য হৃদয়টী ইঁহার ঠিক এ দেশীয় লোকের মত সরল এবং কোমল। ইঁহারই কন্যাকে মহারাজ সুচেত সিংহ বিবাহ করিয়াছেন।

পরে মহারাজা সুচেত সিংহ বাহাদুর প্রথম প্রস্তাব করিলেন, "আমাদের স্বর্গগতা পুণ্যবতী জননী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চরণে সকলের সভক্তি প্রণিপাত এবং তাঁহার পৌত্র বর্ত্তমান সম্রাট্ শ্রীমন্মহারাজ ভিক্টরের প্রতি অকৃত্রিম রাজভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা।"

দ্বিতীয় প্রস্তাবক বিশ্বম্ভর বাবু বলিলেন, "এই জাতীয় সমিতি আমাদের ভারতের পার্লিমেণ্ট। এখানে সর্ব্বসম্মতিতে যাহা কিছু নির্দ্ধারিত হইবে তাহা ঈশ্বরেচ্ছার অনুযায়ী, সুতরাং ইহার আর আপীল বা প্রতিবাদ হইবে না। যদিও আমরা এ সমস্ত নির্দ্ধারণ শূলাগ্র ভাগের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিব না, কিন্তু যাহা সত্য ন্যায়সঙ্গত তাহাতে সমস্ত মানবহৃদয় সায় দিবে। অতএব দেশের যে কোন গুরুতর বিষয় স্থিরীকৃত হইবে তাহা এইখান হইতে হইবে। আমরা এক সঙ্গে এক হৃদয়ে ন্যায্য সঙ্গত বৈধ যাহা কিছু চাহিব তাহা নিশ্চয়ই পাইব। রাজা প্রজা উভয়ের স্বার্থ এক ঈশ্বরের শুভ অভিপ্রায়ের ভিতরে নিমর্জ্জমান হইল। চিরবৈরাগী আর্য্যকুলে জন্মিয়াছি, পার্থিব ধন সম্পদ মান সম্ভ্রম উচ্চ পদমর্য্যাদাকে আমরা তৃণসম জ্ঞান করি। নিস্পৃহ নিরাকাঙ্ক্ষ নিষ্কাম হইয়া দেশের সুশাসনকার্য্যে সাহায্য করিব, আর দেখাইব কত দূর ত্যাগস্বীকার করিতে পারি। ঋষিসন্তান হইয়া আমরা সুখ বিলাস স্বার্থসাধনের জন্য রাজদ্বারে ভিখারী হইব? কখন না। নীচ ঘৃণার কথা। আমরা যখন এইরূপে বাসনাশূন্য হইয়া কেবল ঈশ্বরপ্রীতিকামনায় রাজকীয় বিষয়ে আন্দোলন করিব, তখন কর্ত্তৃপক্ষ আপনি লজ্জিত হইয়া যাহা আমরা চাহি না অযাচিত ভাবে তাহাও দিবেন। সুতরাং এই সমিতি পার্লমেণ্ট অপেক্ষা অনেক উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত।"

পরে নবাব হবিবর হুসেনের প্রস্তাবে সুযোগ্য ধার্ম্মিক দেশহিতৈষী কয়েক ব্যক্তিকে সিলেক্ট কমিটীর সভ্য করা হইল। তিনি বলিলেন, "এই কমিটীর অধীনে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় সভা থাকিবে; তাহাতে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থিত এবং আলোচিত হইবে; কিন্তু বিশেষ গুরুতর প্রস্তাব এবং মূল সত্য সকল উপরিউক্ত সিলেক্ট কমিটী দ্বারা নির্দ্ধারিত এবং মীমাংসিত হইবে। ঐ একটী দ্বার দিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত কার্য্য চলিবে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কাজকর্ম্মের বেশ সুবিধা হইল। বেশী লেখা লিখি, বকাবকি তর্কাতর্কির আর আবশ্যকতা রহিল না! ফলতঃ এই সমিতি রাজপ্রতিনিধির প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া স্বাধীনতা ও অধীনতার সামঞ্জস্যে কার্য্য করিবে। ইহাতে রাজাপ্রজা এক স্বার্থে আবদ্ধ থাকিবেন। এখানকার নির্দ্ধারণে রাজস্বত্ব এবং প্রজাস্বত্ব উভয় সমান পরিমাণে রক্ষা পাইবে। ন্যায় এবং দয়ার সামঞ্জস্যে যাহা নিরপেক্ষভাবে মীমাংসিত হয় তাহা অভ্রান্ত

কোরাণ বিশেষ। জেনেরাল কমিটীর মেম্বর তাঁহারাই হইবেন, যাঁহারা বাস্তবিক দেশের প্রতিনিধি আত্মত্যাগী অথচ জ্ঞানী কার্য্যদক্ষ ন্যায়বান্ ধার্ম্মিক। প্রদেশীয় কমিটীর সভ্যগণও বিভাগীয় প্রজাবর্গের বিশ্বাসী বন্ধু যাঁহারা তাঁহারাই।"

ভারতসন্তানদিগের মধ্যে গুণী জ্ঞানী অথচ নিষ্কাম সদাশয় আত্মত্যাগী ভগবদ্ভক্ত উদার প্রেমিক উপযুক্ত কার্য্যক্ষম বিশেষ চিহ্নিত ব্যক্তি যেখানে যিনি ছিলেন তাঁহারা প্রদেশীয় এবং সাধারণ সভার সভ্য পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। বড় লাট বাহাদুরকে সিলেক্ট কমিটীর সভাপতি পদে প্রতিবর্ষে বরণ করা হইবে ইহাও স্থির হইল।

"নরোত্তমেরাই নরকুলের শাসনকর্ত্তা, হস্তসমষ্টি বা রাজনৈতিক কৌশল নহে।" এই স্বর্গীয় নীতির অনুযায়ী এই শাসন-প্রণালী। সভা সংগঠনের পর সভাপতি ল্যান্স অতি বিনীত মধুর স্বরে সভ্যগণকে ধন্যবাদ দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার এমনি ভাবোন্মাদ হইয়াছিল যে সেই শ্বেত কান্তি পরমসুন্দর তনু কদম্ব কুসুমের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই জন্য অধিক কথা মুখ দিয়া আর বাহির হইল না। অনন্তর নিম্নলিখিত জাতীয় জয়সঙ্গীত গীত হয়।

বিশ্বজনীন বিজয় সঙ্গীত।

১

জয় ভারতের এক পুরাতন,
আর্য্যের গৌরব ব্রহ্ম সনাতন,
জয় দয়াময় হরি!
জয় জয় যোগী ঋষি ভক্তবৃন্দ,
তোমা সবাকার চরণারবিন্দ
সাদরে চুম্বন করি।
(খাদে জয় দয়াময়। জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!)
(জীলে জয় দয়াময়। জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!)
জয় ভব ভয়হারী, কাল কলুষান্তকারী,
দানবারি পাষণ্ডদলন;
তোমার কৃপায় হয়, মরুভূমে জলাশয়,
শ্মশানে আনন্দময় অমর ভবন।

তোমারি এ বিশ্বরাজ্য, সুনিয়ম রাজকার্য্য,
অনিবার্য্য তোমার বিধান,
শূন্য অন্ধকারমাঝে, সাজাইয়া নানা সাজে
প্রকাশিলে এ বিশ্ব মহান্।
সব নর নারীগণে বাঁধিয়া প্রেমবন্ধনে,
বিরচিলে সুখীপরিবার,
তুমি এক পিতা মাতা, আমরা সকলে ভ্রাতা,
তব পদে করি নমস্কার।

সঙ্গীতের পর ব্যাণ্ডের বাদ্য এবং এক শত এক তোপ ধ্বনি হইল। তদনন্তর উৎকৃষ্ট আতরমিশ্র অত্যুৎকৃষ্ট গোলাপ জলের সহিত মিলিত ওডিকলম লবেণ্ডার এবং বিলাতি অন্যান্য গন্ধদ্রব্য একটা স্বর্ণপাত্রে লইয়া সভাপতি স্বহস্তে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি।" বলিয়া সকলের মাথায় ছিটাইয়া দিলেন। এবং তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরি এক এক গাছি ফুলের মালা প্রত্যেকের গলদেশে পরাইয়া দিলেন। তদনন্তর কোলাকোলি পাদবন্দনা হস্তমর্দ্দন প্রণাম নমস্কারের তরঙ্গ উঠিল। পরে স্মিত মুখে প্রফুল্ল চিত্তে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শীত ঋতু পূর্ণ যৌবনে পরিপুষ্ট হইয়াছে, আকাশ গাঢ় নীল, রৌদ্র সুমিষ্ট এবং উজ্জ্বল, হৃদয়ানন্দকর সুখস্পর্শ শীতল সমীরণ পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব গগনের অভিমুখে সবেগে ছুটিতেছে। সেই সুখসমীরণ সেবন করিতে করিতে উল্লসিত চিত্তে মহাসমিতির যাত্রিদল রেলগাড়ীতে চড়িলেন। ষ্টেসনপ্রাঙ্গণভূমি বিবিধ বর্ণের ঋতুপুষ্পে আলোকিত এবং নানা জাতীয় সম্ভ্রান্ত বংশীয় মানবগণে সুসজ্জিত। সারি সারি স্পেসেল্ ট্রেনের এঞ্জিনগুলি মদগর্ব্বিত হস্তীর ন্যায় দাঁড়াইয়া ধূমোদ্গীরণ করিতেছে। প্রত্যেক ট্রেন পতাকা পুষ্প পত্রে বিভূষিত হইয়াছে। ঠনা ঠন ঘন্টা বাজিতেছে, পোঁ পোঁ শব্দে বংশীধ্বনি হইতেছে। কেহ বোম্বে মান্দ্রাজ, রাজপুতানা, কেহ সিন্ধু

করাচি মুলতান, কেহ লাহোর পেষোয়ার আটক, কেহ হিন্দুস্থান, কলিকাতা, কেহ আসাম, উড়িষ্যা নানা দিকে রেলের গাড়ী ছুটিল। যাত্রিগণ মলিদার চোগা চাপকান ও ভাবকোট পরিয়া আঙ্গুর পেস্তা নাসপাতি তরমুজ সেউ বেদানা ইত্যাদি ফল ভোজন করিতে করিতে স্বদেশযাত্রা করিলেন। বিদায় গ্রহণকালে পুনর্বায় আলিঙ্গন, হস্তমর্দ্দন, নমস্কার ধন্যবাদ কোলাকোলি ইত্যাদি দেশী বিদেশীয় রীতিতে পরস্পর প্রেম বিনিময় করিলেন। অনন্তর সকলে সমস্বরে নিজ নিজ ভাষায় মহোৎসবের বিজয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে স্বদেশাভিমুখে চলিলেন। রাজায় প্রজায় যেখানে বন্ধুতা, আহা সে রাজ্য কি সুখের রাজ্য!

যে গাড়ীতে বিশ্বম্ভরের সহচর হৃদয়নাথ তাহাতে একটী সুশিক্ষিত মার্জ্জিত বুদ্ধি যুবক ছিলেন। তাঁহার আকৃতি দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু আয়ত, বয়স যৌবন, বর্ণ গৌর, নিবিড় কৃষ্ণশ্মশ্রু-শোভিত মুখমণ্ডল অতীব মনোহর. কথায় বুদ্ধি এবং চিন্তার প্রতিভা আছে, ব্যবহারে শান্তি এবং ভদ্রতা আছে, অঙ্গে ইয়োরোপীয় পরিচ্ছদ। পথে যাইতে যাইতে দুই জনে বেশ আলাপ পরিচয় বন্ধুতা হইল। দ্বিতীয় দিবসে কথায় কথায় হৃদয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বিশ্বম্ভর বাবুর কেউ হন? নামটি কি আপনার?" যুবক বলিলেন, "আমার নাম ডি, চকরবরটী" অর্থাৎ দিবাকর চক্রবর্ত্তী। বিশ্বম্ভর বাবু আমার ভ্রাতা।

হৃদয়। ও। আপনি সম্প্রতি বিলাত থেকে এসে বুঝি চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাসা করেছেন? হাঁ, এখন বুঝিতে পেরেছি। পরিবার পুত্র কি সব সঙ্গেই থাকে?

দি। আমি অবিবাহিত।

হৃ। বটে! তা বেশ বেশ। কেন, বিবাহ করা হয় নাই কেন?

দি। উচিত বোধ হয় না, প্রবৃত্তিও নাই। আপনার সন্তানাদি কি?

হৃ। তা অনেকগুলি। চারিটী ছেলে তিনটী মেয়ে।

উত্তর শুনিয়া দিবাকরের মুখ খানি একটু বিকৃত এবং ভ্রূযুগল ও ললাট কুঞ্চিত, নাসিকা বিস্ফারিত হইল। তিনি ম্যালথাসের ছাত্র, লোক বৃদ্ধির বিরোধী, সুতরাং চিরকুমার। একটু ভাবনাযুক্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনারা দেশসংস্কারে ব্রতী হইয়া, জনসমাজের হিতের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া একটা বিষয়ে কিন্তু বড় কুদৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন।"

হৃ। কিরূপ কুদৃষ্টান্ত?

দি। একদিকে দুঃখ নিবারণের চেষ্টা, অপরদিকে দারিদ্র্য কষ্টের বৃদ্ধি; লোকসংখ্যা হ্রাসের দিকে আপনাদের দৃষ্টি নাই। আজ কাল সুসভ্য ইয়োরোপ আমেরিকায় হাজারে পাঁচ জন বিবাহ করে কি না সন্দেহ।

সু। আপনার বিবাহে আপত্তি কি সেই জন্য?

দি। তা বই আর কি। অল্প দিনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়া কেন আর নেঞ্জার বাড়ান? তেমন ভাল স্ত্রীও পাওয়া যায় না, তা ছাড়া কতকগুল পঙ্গপাল নিযে শেষ ভোগে কে বলুন।

সু। আপনি দেখিতেছি, গৃহাশ্রমের পবিত্র সুখে তবে এককালে বঞ্চিত।

দি। গৃহাশ্রমে সুখত কিছু দেখি না, কেবল দুঃখই দেখিতে পাই। আমি বেশ আছি। এ কালের শিক্ষিত লোকেরা যেমন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দেয না, তেমনি পারিবারিক বন্ধনের ফাঁদেও সহজে পা দিতে চায় না।

সু। তাহারা চরিত্র ভাল রাখিতে পারে না।

দি। ভালমন্দ বিষযে মতের অনেক ভেদ আছে। আপনি যাহা ভাল বলেন, আমি হয়ত তাহা মন্দ বলি, কিন্তু তারা সুখে আছে; পৃথিবীর অন্নকষ্ট বৃদ্ধি করে না। বিবাহ করিয়াও সেইত বিবাহভঙ্গ, পুনঃ পুনঃ পরিণয়, তবে আর দরকার কি? গত বিশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকায় ছয় লক্ষ বিবাহ ভঙ্গের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয, বিবাহের এইত ফল।

সু। চিরপ্রণয়াবদ্ধ পারিবারিক সুখ, পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্ম বলিযা একটা জিনিষ আছে সেটা কি স্বীকার করেন না?

দি। দেখতে পেলেত স্বীকার করিব। আমি ত দেখি সবই দুই পাঁচ বৎসরের জন্য; নভেল্টি চলে গেলে কে কত দিন কার স্বামী স্ত্রী থাকে? উড়িতে না পারিয়া অনেকে পোষ মানে। সাময়িক বিবাহ যদি এ দেশে চলে, তাহা হইলে ভাল হয়।

সু। বড় দুঃখিত হলেম, মানুষ সম্বন্ধে আপনার এরূপ সঙ্কীর্ণ মত আশা করি নাই। নারীসঙ্গ যে আত্মোন্নতির পক্ষে আবশ্যক সেটা স্বীকার করেন কি?

দি। তা খুব করি। কিন্তু চিরকাল একজনে বদ্ধ থাকাটা প্রবৃত্তি, রুচি এবং উদারতার বিরোধী। তাতে অসুবিধাও যথেষ্ট। উদার সম্প্রদায়ের

লোকেরা ইহাকে কুপ্রথা সঙ্কীর্ণতা মনে করেন। পৃথিবীতে, যখন কেহ কাহাকে চিরদিন বিশ্বাস করে না, তখন একটু তফাত থাকাই ভাল। চিরদিন কেহ কারো বন্ধু থাকে না। আমার জীবন চিরকৌমার পরিব্রাজকের জীবন।

দিবাকর বাবুর বিকৃত বুদ্ধির মীমাংসা শুনিয়া হৃদয়নাথ বুঝিলেন, "ইহা কালের উপযুক্ত কথাই বটে। বিশ্বাসের মূলে ইনি একবারে কুঠার আঘাত করিয়াছেন। লোকের সঙ্গে কেবল হাট বাজারের ক্ষণিক সম্বন্ধ। কাহাকেও হৃদয় দিবও না, কেহ যে হৃদয় দিতে পারে ইহাও বিশ্বাস করিব না। কেবল কাজ আদায় করিয়া লইব। বেশ সিদ্ধান্ত বটে।" (প্রকাশ্যে) "আচ্ছা তবে আপনার জীবনের আশা ভরসা লক্ষ্য কি?"

"বর্ত্তমান অভাব মোচন। বর্ত্তমান জীবন ভালরূপে সম্ভোগ করা।"

"পরিবার ভিন্ন তা কি হইতে পারে?"

"পরিবার ত দুঃখের মূল, স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক। ইচ্ছা নাই, আদরে ভাল লাগে না, অথচ দুই জনে এক সঙ্গে থাক। তাহাতে কেবল বিবাদ অশান্তি। এরূপ স্থলে দাম্পত্যবন্ধনের কুইনাইন না খাইয়া যত দিন বনি বনাও থাকে একত্র রইলাম, তার পর যার সঙ্গে মনের মিল হয় তাহাকে লইলাম, এইত বেশ। আজ কাল সভ্যজাতির ত এই প্রথা।"

হৃ। সন্তানাদির দশায় কি হবে?

দি। তারা পাব্‌লিক্ দাতব্যাশ্রমে মানুষ হবে।

হৃদয়নাথ আর কথা কহিলেন না, কিন্তু তাঁহার মনে বড় দুঃখ হইল। যুবকের ভাব ভঙ্গী আকার প্রকার মিষ্ট ব্যবহার অন্যান্য সুলক্ষণ দর্শনে ভিতরে ভিতরে তাঁর প্রাণটা কাঁদিল। যেন একটী সুন্দর রত্ন ধূলায় আবৃত রহিয়াছে। বিশ্বাসহীন তরল জীবন কি দুঃখের তাহা ভাবিয়া তিনি যেন গভীর চিন্তাসাগরে ডুবিয়া গেলেন।

দি। আপনি কি এ প্রশ্নটী পূর্ব্বে আর কখন ভাবেন নাই?

হৃ। পুস্তকাদিতে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু এ মতের লোকের সহিত বিশেষরূপ আলাপ হয় নাই।

দি। আর একটা বিষয়েও আপনারা গুরুতর অনিষ্ট করিতেছেন। বিধবা বিবাহ এত কেন দেন?

হৃদয়নাথ এ কথা শুনিয়া একটু স্তম্ভিত হইলেন, যুবার মুখের দিকে অবাক

হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পর জিজ্ঞাসা করিলেন; "আপনি এমন উচ্ছৃঙ্খল মতের পক্ষপাতী হইয়া বিধবা বিবাহে আপত্তি করিতেছেন!"

দি। (একটু হাসিয়া) সে প্রকার প্রাচীনভাবে আপত্তি করি নাই। বিধবা কুমারী দুয়েতেই আমার আপত্তি। অর্থাৎ বিধবা বিবাহ দ্বারা লোকসংখ্যা এ দেশে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সুতরাং দারিদ্র্য কষ্টও বৃদ্ধি হইয়াছে। যাদের বংশ লোপ হইবার কথা, তারা বংশ বিস্তার করিতে লাগিল। আমরা পলিটিকেল্ ইকনমি শাস্ত্রকে বড় মান্য করি। আপনারা কেবল "জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি" এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। তিনি পৃথিবীর সীমা আবার কি বাড়াইয়া দিবেন?

হৃদয় আরো একটু বিস্মিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, "বিদ্যা অনেক দূর এগিয়েছে, আর তর্ক করা উচিত নয়। আহা! এমন গুণবান্ সুপুরুষ, বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির অভাবে কি ভ্রান্তিতেই পড়িয়াছে! আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে, ইহাকে পারিবারিক সুখের ছবিটা একবার দেখাই।" তদনন্তর তাহাকে বলিলেন "আপনি আমাদের শান্তিধামে যাবেন?"

দি। সে আবার কোথা?

হৃ। যেখানে আপনার দাদা এবং আমরা সপরিবারে থাকি। চলুন, দিন কয়েক সেখানে থাকিবেন।

দি। বেশত, চলুন যাব।

হৃ। আচ্ছা আপনি যে বলিলেন, বিধবা বিবাহ চলিত হওয়াতে লোক-সংখ্যা বাড়িতেছে, এক্ষণকার জারজ সন্তানের সংখ্যার কোন হিসাব টিসাব রাখেন কি?

দি। যাই হউক, লোক সংখ্যার হ্রাস যাতে হয় তা আপনাদের করা উচিত।

সেই গাড়ীতে আর একটী চটা গোছের রক্ষণশীল শ্রেণীর অর্দ্ধ হিন্দু যাত্রী ছিলেন তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, "তুমি কি তবে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছ না কি?

দি। আমি আমার জন্মের জন্য বিশেষ সুখী নই। বরং দুঃখী।

সঙ্গী। তবে কি মা বাপকে সে জন্য অভিসম্পাত করিয়া থাক?

দি। অভিসম্পাত অবশ্য করি না, কিন্তু পিতার বিবাহ করাটা যে একটা মস্ত ভুল হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস করি।

সঙ্গের চটা লোকটী এ কথায় আরো চটিয়া চড়া স্বরে দুই চারিটা কঠিন কথা প্রয়োগ করিলেন, ইংরাজি ভাষার জোরালো শব্দে ইংরাজি বিদ্যা, ইংরাজ জাতিকে অনেক মন্দ বলিলেন, শেষ রাগিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন এবং তামাকু সাজিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দিবাকরের মেজাজ খুব ঠাণ্ডা উচ্চ কথা, বা বিকৃত মুখভঙ্গী তিনি জানে না। একটু হাসিলেন, যুক্তিযুক্ত কথায় মৃদু স্বরে তাহার উত্তর দিলেন।

হৃদয়নাথের দৃষ্টিতে এটা বড় ভাল লাগিল। এমন যুবা বয়স, তথাপি রাগ নাই, উদ্ধত ভাব নাই, কোন রূপ চাঞ্চল্য নাই, ঠাণ্ডা যেন বরফের চাঁই। চটা বাবুকে তিনি বলিলেন, "আপনি রাগ করিতেছেন, কৈ উনিত রাগ করিলেন না!"

সঙ্গী। ওঁর রাগ হবে কেন? সব যে পুড়িয়ে খেয়ে বসে আছেন। ন্যাটিচুডিন্যারিয়ান যারা, যাদের ধর্ম্ম নাই, নীতি নাই, সত্য নাই, ন্যায় নাই, ভালমন্দ ভেদ জ্ঞান নাই, বিধি ব্যবস্থা নাই, কিসের জন্য তাদের রাগ হবে? য়্যানালিটিক ফিলসফির উত্তাপে কনক্রিট সত্য সব গলিয়া গিয়াছে, সুতরাং সবই নৈরাকার।

হৃ। যাই হউক, শান্তিত আছে।

সঙ্গী। ওকি আর শান্তি! ওরূপ শান্তি কাঠ পাতরের, মড়া মানুষেরও আছে।

পরে যথা সময়ে ট্রেন সেণ্ট্রল ষ্টেসনে পৌঁছিল, হৃদয়নাথ দিবাকর বাবুকে লইয়া গৃহে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দিবাকর বাবু শান্তিধামে অতিথি হইলেন। হৃদয়ের গৃহে পানাহার করিতেন, বসিতেন, এবং অতিথিশালায় শুইয়া থাকিতেন। হৃদয়ের সুন্দর সুন্দর পরিষ্কার ছেলে মেয়ে গুলি গৃহপ্রাঙ্গণে ঝিলের ধারে সন্ধ্যার সময় খেলা করিতেছে, কেহ ফুল গাছের ঝোপে পাখীর বাসা দেখিতেছে, কেহ কুকুর ছানাকে কোলে লইয়া আদর করিতেছে, কেহ ঘোড়া হইয়া

দৌড়তেছে, কেহবা পুতুল সাজাইতেছে। ক্ষুদ্র শিশু এবং বালক বালিকার কাজের অন্ত নাই, ব্যস্ততার সীমা নাই, উৎসাহের বিরাম নাই। তাহাদের প্রতিক্ষণে নব নব কল্পনা, নব নব সঙ্কল্প। জীবন নূতন, সুতরাং পৃথিবীও নূতন, অনুরাগ উৎসাহ নূতন; যা করে তাই ভাল লাগে, তাহাতেই মত্ত হয়, কোন বিষয় নীরস পুরাতন বলিয়া অনুভব করে না। কি জীবন্ত শক্তিই ভগবান্ তাদের ভিতর রাখিযাছেন!

যতী ব্যগ্র হইয়া উৎফুল্ল নেত্রে বলিল, "দিদি, দেখ দেখ! আহা কি চমৎকার পাখিটী! ঐ দেখ বাসায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমি তাই আগে দেখিছি, আমি উটি নেব, আমাকে ধরে দেও না!" এই বলিয়া বুলবুলি পাখিটী ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল।

দিদি। চুপ কর! চুপ কর! ওদিকে যেও না ভাই! তা হলে এখনি উড়িয়া পালাবে। আহা কেমন সোন্দর পাখিটী!

যতী। হ্যাঁ য্যা, তা হোক, আমি নেব।

দিদি। না, না, চুপ কর, উড়ে যাবে, এদিকে সরে এস।

যতী। না, আমি সরে যাব না। ও কেন উড়ে যাবে। তুমি আমায় ধরে দেও।

দিদি। আঃ দুষ্ট ছেলে, ও যে এখন ডিমে তা দিচ্ছে।

যতী। তা দিক্, আমি নেব। কেন ও ডিমে তা দেবে বল না!

ইহাদের দুই জনের ঔৎসুক্য দেখিয়া ননী, ফণী, ললিতা, শরমা প্রভৃতি সেই দিকে উকি মারিতে লাগিল। ভারি আন্দোলন উৎসাহ। গোলযোগ দেখিয়া দিদি তাহাদিগকে ভোগা দিয়া ভুলাইয়া পাখীদের জীবনকাহিনী শুনাইয়া তফাতে আনিল, এবং অন্য খেলায় নিযুক্ত করিয়া দিল।

অন্যদিকে একখানি বেঞ্চে বসিয়া ছোট খোকাটীকে ছোট খুকী কোলে লইয়া আদর করিতেছিল। আদর করিতে করিতে খোকার চখে ঘুম আসিয়া পড়িয়াছে। কোল অপেক্ষা ছেলে বড়, ধরিযা রাখা যায় না, খুকী সামলাইতে না পারিয়া বিব্রত হইয়াছে। খোকার ঘুমেভরা চক্ষু দুটি ঢুলু ঢুলু; দেখিতে দেখিতে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল, আরো ভারি হইল। গোলাপ ফুলের মত গাল দুইটী; তার সম্মুখে মুদ্রিত দুইটী নয়ন। আহা ঘুমন্ত ছেলে দেখিতে কি সুন্দর! যেন দেবশিশু যোগনিদ্রায় নিমগ্ন। খুকী তাহাকে সামলাইতে না পারিয়া শ্রান্ত হইয়া ব্যাকুলভাব সহিত দিদিকে ডাকিতেছে।

দিদি আসিয়া তাহাকে ঠিক মায়ের মত কোলে লইল, আস্তে আস্তে ঘরে লইযা গিয়া শোযাইল।

বিনোদিনী ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁতে সূতা কাটিযা ফুলেব মালা গাঁথিতেছে, নটু আস্তে আস্তে পা টিপিযা টিপিযা পশ্চাতেব দিক্ হইতে দুই হস্তে তাহার চক্ষু আবরণ করিল।

বি। কে রে! ফনু বুঝি?

নটু। চুপ।

বি। হ্যাঁ বুঝিছি, আমাব সঙ্গে আবাব চালাকি! নটু!

নটু তখন হাত দুটি তাহাব গলায জড়াইযা আনন্দে হাসিযা গড়াইযা পড়িল। আহ্লাদেব আব সীমা নাই। হাসি আব থামে না।

পব পব সমস্ত ছেলে মেযে গুলিব ভালবাসা নিম্নগামী হইয়া সর্ব্ব কনিষ্ঠ সেই এক বৎসরেব ছোট খোকাটীব উপব পড়িযাছে। যে যাহা খাদ্য বা খেলনা পায় তাহাব কাছে আনিযা উপস্থিত করে। বিশ্বম্ভর অকালের একটী সুন্দব পাকা আম হাতে করিযা "কে আম নেবে!" কেউ লইতে চায না। বড় বোনটীব হাতে তিনি তাহা দিলেন, সে লইযা তাব ছোটকে দিল, সেও আবার তার ছোটকে, ক্রমে ক্রমে শেয খোকা বাবুব করকমলে পতিত হইল। তিনি তাহাকে দুই হস্তে বুকে ধরিযা নানা স্থানে মুখ লাগাইলেন, অধরামৃতে সিক্ত করিলেন, শেষ ফেলিযা দিলেন। তখন দিদি তাহা সকলকে বিভাগ করিযা দিল, আপনি শস্যহীন আঁটিটী চুষিল।

সন্তানগণের ক্রীড়া কুর্দ্দন হাসি নৃত্য, কৌতূহল আনন্দ আশা উদ্যম আহাব বিহাব, তাহাদিগেব পবস্পবেব প্রতি আদর মমতা স্নেহ ভালবাসা দেখিযা দিবাকরেব হৃদয় অলক্ষিত ভাবে একটু আর্দ্র হইল। তখন তিনি গৃহদ্বাব সংলগ্ন "সুইট হোম" শব্দ পাঠ করিয়া অনন্য মনে ভাবিতে লাগিলেন। একটী যেন নূতন রাজ্য তাঁহাব চক্ষেব সমক্ষে আস্তে আস্তে দ্বার উদ্ঘাটন করিতে লাগিল।

প্রতি দিন এই শোভা তিনি দেখিতেন আব পুলকিত চিত্তে তাহা আলোচনা করিতেন। গৃহকর্ত্রী যখন স্বামীব সহিত এক সঙ্গে বসিযা ঐ সকল বালক বালিকাদিগকে লইযা আমোদ আহ্লাদ গল্প এবং পান ভোজন করিতেন, তদ্দর্শনে দিবাকর বাবুব হৃদয় আরও মুগ্ধ হইত। তিনি খাইতেন আর গৃহস্থদিগের পারিবারিক সুখ সৌন্দর্য্য দেখিতেন। হৃষ্ট পুষ্ট ছেলেটী

খেলিতে খেলিতে দৌড়িয়া আসিয়া জননীর গলা জড়াইয়া ধরিল, অমনি জননী তাহার গালে চুম খাইলেন, সন্তান মিষ্ট স্বরে মধুর ভাবে দুইটী কি কথা কহিল, তিনি তাহার উত্তর দিলেন, আবার সে দৌড়িল। হাসি হাসি মুখ কোমলাঙ্গ সন্তানদিগকে বক্ষে লইয়া পিতা মাতার মনে যে কি স্বর্গীয় সুখের আবির্ভাব হয়, দিবাকর তাহাব কিছু আভাস এখানে পাইলেন। এইরূপে দুই চারি দিন এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহাব মনের গতি কতকটা ফিরিয়া গেল। তখন তিনি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগের সঙ্গে মিশিয়া আপনিও কৌতুকামোদে মত্ত হইলেন। মানব সমাজ অপেক্ষা শিশুসঙ্গ তাঁহাব অতিশয় প্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে ছেলে কোলে করা অভ্যাস ছিল না, এক্ষণে তাহাদিগকে কোলে লইবার জন্য হস্তদ্বয় এবং বক্ষ যেন আপনা আপনি প্রসারিত হইয়া পড়িত। তাহাদেব অর্দ্ধস্ফুট মিষ্ট মিষ্ট কথা, ফুলেব মত কোমল শরীর, স্পর্শালিঙ্গন হাসি অতীব সুখকব বোধ কবিতে লাগিলেন। ঐ সকল সুকুমারমতি সন্তানগণের প্রতি পিতা মাতাব অকৃত্রিম স্নেহ বাৎসল্য, তাহাদের লালন পালনজন্য ভাবনা চিন্তা, উদ্বেগ, ব্যাকুলতা, যত্ন এবং অকাতর পরিশ্রম ত্যাগস্বীকার দিবাকরের পক্ষে একটী নূতনবিধ সরস শিক্ষাপ্রণালী মনে হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "ইহা দেখিতেছি একটী অভিনব রাজ্য, আমার নিকট ইহা এত দিন অনাবিষ্কৃত ছিল। সংসারে আসিয়া তবে আমি কি দেখিলাম, কিইবা সম্ভোগ করিলাম! কেবল বিয়োগবিজ্ঞানের কঠোর মৃত নিয়ম পাঠে কি প্রাণ বাঁচে? এই ভাবে সৎ স্ত্রীসঙ্গে পুত্রকন্যাগণে পরিবেষ্টিত হইযা বোধ হয চিবকালই থাকা যায। এ প্রকার পারিবাবিক সুখ বোধ হয় কখন পুরাতন হয় না। ইহাতে বন্ধভাবও কিছু দেখি না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শান্তিধামে এই সময় মহিলাদিগের একটী উৎসব হয়। দয়ার ভগিনী অর্থাৎ দুঃখীদিগের সেবিকাগণ তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় সৎকার্য্যের সাম্বৎসরিক উৎসব করেন। দর্শক এবং সভ্য সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দুই শত মহিলা, তন্মধ্যে কতক সধবা বিধবা, কতক প্রবীণা কুমারী। অদূরে কতকগুলি গরিব দুঃখী অন্ধ আতুর। অদ্য তাহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত সেবা করা হইবে। মহিলাগণের সঙ্গে অনেকগুলি বালক বালিকাও আছে। চারিদিকে বড় বড় ফুটন্ত এবং আধ ফুটন্ত শত শত গোলাপের গুচ্ছ, নবজাত সজীব সুন্দর পাতা লতা এবং ফুলের মালায় সভাগৃহটী অতি সুন্দররূপে সজ্জিত, তাহার মধ্যে শ্বেত পীত লোহিত নীল বর্ণের বোম্বাই বেনারসি বস্ত্র এবং সাটীনের জামা গায় নারীগণ বসিয়া আছেন, পুষ্পগন্ধের সহিত তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ-বিনিঃসৃত বিবিধ সৌগন্ধরাশি চারিদিকে ছুটিতেছে, কুলবালাগণের পরম রুচির সহাস্য মুখগুলি যেন শত শত চাঁদের উদয় করিয়াছে। ছেলে মেয়েগুলি তৎপার্শ্বে তারকাবৎ বিরাজ করিতেছে। বিশ্বম্ভর, অমরনাথ, হৃদয়নাথ, দীনেশ প্রভৃতি উৎসাহদাতাগণ বারান্দায় উপস্থিত আছেন, দিবাকরও তন্মধ্যে স্থান পাইয়াছেন।

শ্বেতপদ্মের ন্যায় শুভ্রকান্তি শুক্লবসনা একটী বিধবারূপিণী নারী প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। পরে দয়ার ভগিনীগণ কোথায় কে কি কার্য্য করিয়াছেন তদ্বিবরণ পঠিত হইল। আহা সে সকল কার্য্যবিবরণ শুনিলে চক্ষে জল আসে। দয়ার তুল্য আর ধর্ম্ম নাই। পরে উক্ত দেবী-মূর্ত্তি নারী পারিবারিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী উপদেশ দিলেন। উপদেশটী যদিও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অতি সুমিষ্ট। উপদেশদাত্রীর নামটী নিরঞ্জনা, বয়স ত্রিশ বত্রিশ, সেবানুরাগের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে তাঁহার মুখমণ্ডল বিভাসিত। অলঙ্কারবিহীন শ্বেতাব্জসদৃশ অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যের যদি কিছু বিশেষ আকর্ষণ থাকে, তবে তাহা ইঁহার ছিল। প্রচুর পরিমাণে ছিল। যেন মূর্ত্তিমতী স্নেহকারিণী ভগ্নীরূপ। ইহা দর্শন মাত্র রোগী শোকার্ত্ত শ্রান্ত অসহায় নরনারীর ভগ্নান্তঃকরণে শান্তি সঞ্চারিত হয়। তাঁর পরদুঃখমোচনে ব্যস্ত হস্তদ্বয় যেন স্নেহের সুখশয্যা,—সান্ত্বনাপূর্ণ

মৃদু বাক্যসকল যেন শান্তিরাজ্যের আহ্বান ধ্বনি,—প্রেমবিগলিত ছল ছল নেত্র যুগল যেন অনাথ দীন জনের তৃষ্ণা নিবারক শীতল জলাশয়। সহানুভূতি মাখা ব্যাকুলতাব্যঞ্জক মুখ খানি, এবং মধুর আশাবচনগুলি কাঙ্গাল গরিবের পক্ষে সদাব্রতের ভাণ্ডার স্বরূপ। তদীয় গম্ভীর অথচ প্রসন্ন মূর্ত্তি দর্শনে এবং সুললিত সঙ্গীতবৎ বাক্যাবলী শ্রবণে দিবাকর বড় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। চারিদিকে বিচিত্র বর্ণের পরিচ্ছদধারিণী কুলকন্যা-গণের মধ্যস্থলে সেই শুভ্রমূর্ত্তি রজতসন্নিভ দিব্যকান্তিময়ী রমণী যেন শ্বেত-পদ্মাসনা দেবী সরস্বতীর ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার সুকণ্ঠ বিনিঃ-সৃত সার সার কথাগুলিও বীণাধ্বনিবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। নিরঞ্জনা এইভাবে সে দিন উপদেশ দান করেন।

"প্রিয়তমা ভগিনীগণ! যে মহাব্রত পালনের জন্য চিরকৌমার ব্রতধারী পবিত্র যিশু পথের কাঙ্গালী হইলেন, যে জন্য রাজপুত্র শাক্য স্ত্রী পুত্র রাজ্যপাট ছাড়িয়া, প্রেমিকচূড়ামণি গৌরাঙ্গ জননী সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে দেশে দেশে বেড়াইলেন, সেই ব্রতে তোমরা ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহ, ক্ষুদ্র হৃদয় মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? তাঁহারা যদি মহাবৈরাগ্যানলে জীবনশোণিত আহুতি না দিতেন, তাহা হইলে কি আজ গৃহাশ্রম এরূপ পবিত্র শান্তিধাম হইত? তাঁরা সন্ন্যাসী না হইলে আমরা গৃহে লোকালয়ে থাকিতেই পারিতাম না। আহা! সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত দান করিয়া মানবসমাজকে তাঁহারা এই বর্ত্তমান অবস্থায় আনিয়া দিয়া গিয়াছেন। পরের সুখে সুখী ও পরের দুঃখে দুঃখী এমন আর কে হইতে পারিবে? পৃথিবীর পাপ তাপ দুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোকে তাঁদের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। আহা মহাত্মাদের সেই ক্লেশভারের কণামাত্রও যদি আমরা বহন করিতে পারি, নারী-জীবন সার্থক হইবে। দয়ালু ভক্তগণের পথের পথিক হইয়া তাঁহাদের দুঃখাশ্রুর সঙ্গে যদি আমরা এক বিন্দু অশ্রুজল মিশাইতে পারি, তাঁহাদের পদধূলি মাথায় লইয়া দরিদ্রসেবায় যদি জীবন অন্ত করিতে পারি, পরিণামে অমরধামে তাঁদের সহবাসে এবং ইহলোকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আমরা স্থান পাইব। দুঃখীর বন্ধু যিশু বলিতেন, কাঙ্গালকে অন্ন বস্ত্র ঔষধ পথ্য দিলে তাহা আমাকে দেওয়া হয়। আমাদের এই ক্ষুদ্র সেবা কি তিনি গ্রহণ করিবেন না? ভগ্নীগণ,

যাহাদের মাতা নাই তাহাদের তোমরা মাতা, যাহাদের ভগ্নী নাই তাহাদের তোমরা ভগ্নী। তোমাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহ দয়া সহানুভূতি লাভ করিয়া দীন অনাথগণ কতই না আরাম পায়! তাঁহাদের চিরদুঃখে আহত ভগ্ন হৃদয়ের সেই সুখ শান্তি আন্তরিক আশীর্ব্বাদ স্মরণে তোমাদের সেবানুরাগ কি শতগুণে আরো প্রজ্বলিত হইবে না? অনাথ দীনজনের সুখ দুঃখ তোমাদের সুখ দুঃখ হউক, তাদের আর্ত্তনাদ ক্রন্দনের সহিত তোমাদের ক্রন্দন মিশিয়া যাউক! ভক্তির সহিত নরনারীর সেবা করিলে তাহা ঈশ্বরের চরণে গিয়া উপনীত হয়। সেবায় পরমানন্দ, সেবায় মুক্তি, সেবায় শান্তি, সেবায় সশরীরে স্বর্গভোগ।"

অতঃপর বামাগণ মধুরকণ্ঠে সমতানে এই গীতটী গাইলেন।

বিভাস—একতালা।

"দুঃখে অনাহারে, বিপদ আঁধারে, ফেল যদি মোরে হে দীনশরণ।
বিপদভঞ্জন মুরতি তখন হৃদয়মাঝারে দিও দরশন।
নিজে দুঃখী হয়ে পরদুঃখ লাগি, থাকি যেন আমি সদা অনুরাগী,
আপনি কাঁদিয়ে দয়ার্দ্র হৃদয়ে পরদুঃখ অশ্রু করিব মোচন।
দুঃখদাবানলে পুড়ে যদি প্রাণ, দুঃখে দুঃখে দিন হয় অবসান,
তাহে যেন আমি না হই অধোগামী কঠোর হৃদয় কখন;
দুঃখের ভিতর হেরি তব মুখ, পাসরিব সব অপমান দুখ,
কাঁদিতে কাঁদিতে বলিব আনন্দে তব শুভ ইচ্ছা হউক পূরণ।"

উপদেশের সুমিষ্ট গভীর ভাব এবং হৃদয়দ্রবকারী সঙ্গীত ধ্বনিতে দিবাকরের চিত্ত দ্রবীভূত হইল। তাঁহার মনে হইল, "হায়! আমার জীবন কি অসার? কি মূঢ় আমি? (Live for others) 'অন্যের জন্য জীবন' এ কথাত সকলেই বলিয়া গিয়াছেন। বহুকাল হইতে আমি ইহা শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত এতদিন পরে দেখিলাম। আহা যিনি উপদেশ দিলেন, তাঁহার সুমিষ্ট করুণ স্বর, স্নেহার্দ্র মুখকমল, প্রেমের অশ্রুবারি আমাকে যেন কি করিয়া ফেলিল। ঐ প্রিয়দর্শনা নারীর পদধূলি লইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। ঘরকন্না যদি করিতে হয়, তবে এইরূপ লোকের সঙ্গে মিশে করা উচিত।"

সভাভঙ্গের পর বিশ্বম্ভরের সাহায্যে নিরঞ্জনার সহিত দিবাকর বাবুর

কিছু কিছু আলাপ পরিচয় হইল। তাঁহার সলজ্জ অথচ সাহসব্যঞ্জক, মাধুর্য্যময় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বিনম্র ব্যবহারে দিবাকরের আর্দ্র হৃদয় আরো আর্দ্রীভূত হইয়া গেল। ধর্ম্মভাব কাহাকে বলে, এবং তাহা কেমন মধুর শান্তিপ্রদ এত দিন পরে তিনি তাহার আস্বাদ পাইলেন।

কিন্তু বাস্তবিক কি সেটা ধর্ম্মভাব? না কবিত্বরসসিক্ত প্রেমানুরাগ? যাহাই হউক, আপাততঃ ধর্ম্মের নামে সে আপনার পরিচয় দান করিল। ধর্ম্মাত্মা নারীর প্রতি ভালবাসার টান ধর্ম্ম ভিন্ন আর অন্য কোন্ নামে পরিচিত হইতে পারে? যে ভাবেই হউক, পরিণামে তাহা অমৃতে পরিণত হইবে। কিন্তু মানুষ কি ভ্রান্ত! আপনাকেও আপনি সে শীঘ্র চিনিতে পারে না। তাহার ভিতর দিয়া কখন কি ভাবের কার্য্য হয় তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণে সে অক্ষম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিরঞ্জনা দেবীর ইতিহাস বড় রমণীয়। পাঠক মহাশয়কে তাহা কিঞ্চিৎ শুনিতে হইবে। ইহা আশাকাব্যের অন্তর্গত একটী সুন্দর চরিত্র; এই জন্য আমরা লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাহার স্বামী এক জন ব্রাহ্মকুলোদ্ভব উৎসাহী যুবা। তিনি অনেক লম্বা লম্বা উপদেশ দিতেন। "ধর্ম্মই স্ত্রীজাতির একমাত্র ভূষণ, যোগ ধ্যান বৈরাগ্য, জপ তপ ব্রত, সংযম নিয়ম উপাসনা অতিথিসেবা ব্যতীত স্ত্রীজীবন কেবল চিত্রপট বিশেষ। যে গৃহাশ্রমে অতিথিসেবা এবং ধর্ম্মকর্ম্ম নাই তাহা শ্মশান তুল্য।" এবম্বিধ অত্যুচ্চ সুগভীর উপদেশ দ্বারা তিনি বহু বহু বক্তৃতা প্রদান করিতেন। কিন্তু এ সকল শিক্ষা কার্য্যকালে নিজগৃহে কিরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিবে তাহা তিনি আগে জানিতে পারেন নাই।

নিরঞ্জনা সহজেই ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, পরদুঃখ দেখিলে তাঁহার চক্ষে জল আসিত, তাহার উপর আবার নিজস্বামীর মুখে এই সমস্ত উচ্চতর উপদেশ, কাজেই ধর্ম্মকর্ম্মে এবং জীবসেবায় তাঁহার অতিশয় অনুরাগ বৃদ্ধি হইল। উপাসনায় বসিলে তিনি শীঘ্র উঠিতে চাহিতেন না। প্রাতে

নাম গান উপাসনা, মধ্যাহ্নে অতিথি এবং দীনসেবা, সন্ধ্যায় ধ্যান চিন্তা নাম জপ, এই ভাবে নিয়মিতরূপে তিনি যোগ বৈরাগ্য ভক্তি প্রেম সাধন করিতেন।

নিরঞ্জনা দেবী বাহুল্যরূপে উপাসনা ভজন সাধন করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, অতিথি অভ্যাগত আত্মীয় বন্ধু সাধু ভক্ত এবং কাঙ্গাল দুঃখীর সেবায় শেষ একবারে জীবন ঢালিয়া দিলেন। অনেক সময় স্বহস্তে রন্ধন এবং পরিবেশন করিয়া কাছে বসিয়া যত্ন এবং শ্রদ্ধার সহিত তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন, গায়ে বাতাস দিতেন। কোন সাধু বন্ধু অতিথি হইলে আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে দুই চারি দিন বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহার নিকট যোগ ভক্তির কথা শুনিতেন। হরিকথা শ্রবণে নিরঞ্জনার কোমল হৃদয় গলিয়া যাইত, নয়নে বারিধারা বহিত, তজ্জন্য ভাবাবিষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে তিনি তুষ্ণীভাবে বসিয়া থাকিতেন। কখন বা নাম গান করিতেন। ফকীর সন্ন্যাসীর মুখে তীর্থভ্রমণের কথা শুনিবার জন্য তাঁহার চিত্ত বড়ই ব্যগ্র হইত।

এই সমস্ত সাধুকার্য্যে কেবল সময় ব্যয় অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল তাহা নহে, নিরঞ্জনার বিলাসাসক্তি কমিয়া গেল, মন উদাস হইল, হরিভক্তিতে কিছু মত্ততা জন্মিল।* তখন স্বামী মহাশয় বড় বিপদে পড়িলেন। তাঁহার বক্তৃতা করা রোগত ইহাতে সারিয়া গেলই, অধিকন্তু সেই রোগের ফলে এখন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কতকটা বৈরাগ্য বিরক্তির তিক্তরস তিনি সেবন করিতে বাধ্য হইলেন। কুসংস্কারবর্জ্জিতা সুশিক্ষিতা সুন্দরী যুবতী স্ত্রী হইয়া এই ঘোর কলিকালে কে এমন বৈরাগিণী হইতে চায়? বিংশ শতকের সুসভ্য সৌখীন যুবার পক্ষে এটা অতিশয় হৃদয়-বিদারক দৃশ্য সন্দেহ নাই। উত্তম বসন ভূষণ, আহার পান, উৎকৃষ্ট শয্যায় অরুচি, কোন আমোদ বিলাস নাই, কেবল উপাসনা আর অতিথিসেবা, এত বাড়াবাড়ী ভাল লাগিবে কেন? পরিশেষে স্ত্রীর বৈরাগ্য অনাসক্তি স্বামীর হৃদয়ে শেল সম বাজিতে লাগিল। ধর্ম্মকর্ম্ম দীনসেবাকে তখন তিনি অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের কাজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ তাহার অস্থি মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে এখন ছাড়ায় কার সাধ্য? স্বামী তখন মনে মনে অনুতাপ সহকারে বলিতে লাগিলেন, "হায়! কি ঝকমারির কাজই করিছি। এমন নরম মন, তরল হৃদয়, বিষয়বোধহীন যদি আগে জানিতাম,

তাহা হইলে কি এত বড় বড় উপদেশ দিতাম? কোথায় দুই জনে সুখে আমোদ বিহার করিব, বগী হাকাইয়া গড়ের মাঠে বেড়াব, ডিনার খাব, নাচ তামাসা দেখিব, নিজের ঘরকন্নাটী ভাল করিয়া গোছাব, ভবিষ্যতে সন্তানাদির জন্য সঞ্চয় করিব, তা নয় কেবল পরকে লইয়া ব্যস্ত।"

নারী প্রকৃতির ভিতর দেবী প্রকৃতির কি মহাশক্তি আছে বাবুটীর তাহা আগে জানা ছিল না। ক্রমে তাঁহার মনে কতকটা বিরক্তিবৈরাগ্য, কতকটা ভয়, কতকটা ক্রোধের উদয় হইল। নিরাশ এবং দুঃখে পড়িয়া শেষ ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, "আর আমার বাঁচতে ইচ্ছা হয় না। কিছু ভাল লাগে না। মানবজীবনে কেবল মরণেই শান্তি।"

নিরঞ্জনা। মৃত্যু কামনা করা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী। বরং এস, সে জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিয়া দুজনে আমরা পরলোকের সম্বল সঞ্চয় করি।

স্বামী। যাও, আর জ্যাঠামি কর্ত্তে হবে না! ও সব কথা অনেক জানা আছে!

নিরঞ্জনা মৃদু হাস্যের সহিত সভয়ে বিনম্র মধুর ভাবে বলিলেন, "এ সবত তোমারই কথা। তবে কেন এখন জ্যাঠামি বল্‌ছ?"

স্বামী। হলই বা আমার কথা! তাব কি আর সময অসময় নাই? বাইরে কযে কোথায় কি বলিছি এখানে তার সঙ্গে সংশ্রব কি?

নি। তুমি কি না মৃত্যুব কথা পাড়লে, তাই বল্‌লাম। বিনা সম্বলে কি মৃত্যু প্রতীক্ষা কবা ভাল?

স্বামী। মরবার জন্য আমাব বয়ে গিযেছে! সাধে কি মরণ কামনা করি?

বাবুটীর চিরকাল বক্তৃতা করা, উপদেশ দেওয়া অভ্যাস, পাছে আবার সে সব বাহির হইয়া পড়ে, এই ভযে তিনি সংক্ষেপে কথা কহিতেছেন। অনন্তর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িযা ঔদাস্য মনে বলিয়া উঠিলেন, "সংসার বাস্তবিক আব আমার ভাল লাগিতেছে না। সব ছেড়ে ছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে এবার বনে চলে যাব।"

নি। তা হলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। দুই জনে বনে বসে বেশ যোগ সাধন করিব। তুমি তপস্যায় নিযুক্ত থাকবে, আমি ফুল ফল সংগ্রহ করে এনে দেব, সেবা ভক্তি করব; নির্ঝর হইতে কমণ্ডলু পূরিয়া জল আনিব। একটী হরিণ পুষিব। দুই জনে বেশ ঋষিপরিবারের মত থাকা যাবে। বনে যেতে আমার বড় ভাল লাগে।

স্বামী। আবার তোমার সঙ্গে! কখন নাথ একাই আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াব, আর লোকের বাড়ীতে যেখে খাব। কেবল এক কম্বল আর কমণ্ডলু সঙ্গে থাকবে। আর কিছু না।

নি। সেই যদি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীই হবে, তবে বনে যাবারই বা দরকারটা কি? "গৃহই তপোবন" আগে বল্‌তে, এখন এস না কেন দুই জনে গৃহে থেকে যোগ বৈরাগ্য সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করি?

স্বামী। কে সন্ন্যাসী হতে চায়? আমি কি গাঁজাখোর তাই সন্ন্যাসী হব? যে আমার কথার অবাধ্য তাকে নিয়ে আমি সংসারেও থাকব না, বনেও যাব না।

অতঃপর আর সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধব্যঞ্জক গম্ভীর রবে স্পষ্ট কথায় এক দিন বলিয়া ফেলিলেন, "ও গো। উপাসনায় অত বিলম্ব করিলে চলিবে না! আমাকে পরের চাকরী করিতে হয়, ও সব ধর্ম্মের বিলাস, ইহাতে কেবল আলস্য বাড়ে, কর্ত্তব্যজ্ঞান লোপ পায়। ধর্ম্মোন্মত্ততা স্ত্রীজাতির পক্ষে মহা অনিষ্টকর।" মনে মনে বলিলেন, "স্ত্রীজাতিকে আর যেন কেহ কখন উচ্চ ধর্ম্ম শিক্ষা না দেয়।"

নিরঞ্জনা। তুমি কেন আমায় নিয়ে রোজ রোজ উপাসনাদি কর না? আমি মেয়ে মানুষ, কিছুত বুঝিতে পারি না, ঠাকুর ঘরে বসে থাক্‌তে ভাল লাগে তাই বসে থাকি।

স্বামী। অতক্ষণ সেখানে বসে কি কর? বিরক্ত বোধ হয় না?

নি। না, বড় ভাল লাগে। ঠাকুর যেন আমার কাছে এসে মিষ্টি মিষ্টি স্বরে আশার কথা বলেন, আর আশীর্ব্বাদ করেন। তাঁর আদর স্নেহ ভালবাসায় আমি যেন কি হয়ে যাই।

স্বামী। সে জন্য এত বিলম্ব কেন হবে?

নি। উঠে আস্‌তে যে ইচ্ছা করে না। বড় আরাম বোধ হয়। প্রাণের ভিতর যেন শান্তির নদী বহিতে থাকে।

স্বামী। অল্‌ হাম্বাগ্‌! ও সকল আফিংখোরের খেয়াল। আজ থেকে আমি বল্‌ছি, তুমি উপাসনায় বিলম্ব করিতে পা-বে-না। আর যে সে লোক বাড়ীতে এলেই যে নিজে রেঁধে পরিবেশন করে কাছে বসে তাকে খাওয়াবে, যার তার সঙ্গে গল্প করবে, অপরিচিতকে বাড়ীতে রাখবে, এতে আমার মত নাই।

নি। গল্প আর আমি কি বাজে গল্প করি? সাধু ভক্ত কেউ এলে দুই চারটা ভাল কথা শুনি।

স্বামী। না, তা আর তোমায় শুনতে হবে না। যদি কাহাকেও খাওয়াইতে হয়, রাঁধুনীকে বলে দেওয়া যাবে, সে বাইরে ভাত দিয়ে আসবে। কে কি ভাবে আসে তা কি জান? (মনে মনে,—নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক!)

নি। যদি কেউ মন্দ লোক হয়, তাতে আমার কি? ভক্তের মুখে, অতিথি দীন দুঃখীর মুখে ভগবান ভোজন করেন, আমি সেই বিশ্বাসে সেবা ভক্তি করি। এ সব কথা ত তুমিই শিখিয়েছিলে।

স্বামী। তা হোক, তখন আমি বুঝিতে পারি নাই, এখন সে সব ভুলে যাও। স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতিও কি তোমার দৃষ্টি নাই? ইহাতে যে অত্যন্ত অধর্ম্ম হয়! কেন তুমি মোটা ময়লা কাপড় পরে থাকবে,—চুল বাঁধবে না,—খালি মাদুরে শোবে,—ভাল খাবে না, পরবে না? ক্রমে তোমার শ্রী লাবণ্য সব যে গোল্লায় যাচ্ছে তা কি দেখ্‌তে পাও না? ব্যারাম হলে শেষ ভুগবে কে? তখন কি ঐ সাধু ভণ্ড ব্যাটারা কেউ খবর নেবে?

নি। নীরব।

স্বামী। চুপ করে রৈলে যে? কথার উত্তর দাও না এখন? স্বামী-সেবাটা কি ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয় না? পতিভক্তিই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম, ইহাতেই তোমাদের পরিত্রাণ। (মনে মনে—আমি একটা পান খেতে পাই না, ভক্তসেবা!)

নি। নীরব।

স্বামী। চুপ করিয়াই থাক, আর যাই কর, আমি স্পষ্ট বল্‌ছি, ফের যদি তোমায় রান্নাঘরে দেখতে পাই, আর হলুদমাখা হাতে, মোটা কাপড় পরে আল্‌গা গায়ে, রুক্ষ মাথায় যদি তুমি থাক, তা হলে আমি তোমার মুখ দেখব না। কোন অতিথি কিম্বা কুটুম্ব বন্ধু বান্ধবকে তুমি নিজে পরিবেশন করে খাওয়াতে পাবে না। এই আমার হুকুম, মানবে কি না বল?

নি। আমি যে লোকের সেবা বিশেষতঃ গরীব কাঙ্গাল এবং সাধু ভক্তের সেবা না করিয়া থাকিতে পারি না।

স্বামী। আমায় না বলে কয়ে কেন তুমি বিশ্বম্ভরের বাড়ীতে যাবে?

স্ত্রী। তাদের সেখানে ভাল উপাসনা হয়, আর তাঁরা আমায় একটু দয়া স্নেহ করেন, ভাল বাসেন, তাই যাই।

স্বামী মহাশয় ক্রোধবিজৃম্ভিত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আর ভাল বাসতে হবে না। তুমি ভিজে বেবাল। সেবা টেবা চক্ষু বোজা সব মিথ্যা।"

এই নিদারুণ মর্ম্মান্তিক বাক্য শ্রবণে নিবঞ্জনাব মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঝন্ ঝন্ কবিযা উঠিল, দুই কাণ দিযা ঝাল বাহির হইতে লাগিল, মস্তিষ্ক ঘুবিতে লাগিল, গা ঘামিল, চক্ষু অন্ধকাব দেখিল। শেষ অজস্র বারিধারা বর্ষণ কবিতে কবিতে তিনি অধোবদনে কাঁদিতে লাগিলেন।

নিবঞ্জনাব স্বামীব সঙ্গে পাঠক মহাশযদেব অনেক দিন পূর্ব্বে একবাব আলাপ হইযাছিল। ইনি সেই নলিনীকান্ত বাবু। নলিনী বাবু স্ত্রীর দুবা-বোগ্য ধর্ম্মবোগ কিছুতেই ছাড়াইতে না পাবিযা শেষ বোগীকে ছাড়িয়া দেন এবং আপনি উৎপথগামী হইয়া পুনর্ব্বাব বিবাহেব জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা জুটিযা উঠে নাই। সেই অবধি নিবঞ্জনাও বিধবাব ন্যায় বিধবা-দেব দলে ধর্ম্মকর্ম্মে এবং পবসেবায কালাতিপাত কবিতেন। বঙ্গীয মহিলা-সমাজে ধর্ম্মশিক্ষা দেওযা এবং উপাসনাদি কায্য কবাও তাহাব জীবনেব এক প্রধান ব্রত ছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুন মাসেব প্রথমে নব বসন্তেব প্রাতঃ সমীবণ সেবন কবিতে কবিতে এক দিন দিবাকব বাবু নগবপ্রান্তবর্ত্তী উদ্যান অঞ্চলে ভ্রমণে বাহিব হইযাছেন। যে দিন হইতে নিবঞ্জনাব নির্ম্মল শ্বেত কান্তি শুভ্র মূর্ত্তিটী তাঁহাব চক্ষে পডিযাছে তদবধি আর তাহাব মনে অন্য চিন্তা ছিল না। যুবাব মনে এত দিন পবে বিবাহবিষযে এক গভীব আন্দোলন উঠিযাছে। এক দিকে দাম্পত্য জীবনেব মাধুর্য্য, পাবিবাবিক সুখেব প্রলোভন, এবং নাবীপ্রকৃতিব কমনীয আকর্ষণ, অপব দিকে সন্তান পালন, অর্থেব জন্য পবাধীনতা, সংসারেব গুরুতব পবীক্ষা, চিববাধ্যতা, প্রেমের অস্থাযিত্ব এবং

তৎসংক্রান্ত বিশ্বাসঘাতকতা নিরাশা ক্লেশ যন্ত্রণা ইত্যাদি ভাবনায় দিবাকর বাবুর চিত্তকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। প্রাণ টানিতেছে গৃহধর্ম্মের দিকে, সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি দেখাইতেছে নানাবিধ ভয় বিভীষিকা। এই অবস্থায় ভাবিতে ভাবিতে তিনি পথে চলিতেছেন। চলিতে চলিতে হঠাৎ বাম পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, একটী বাড়ীর সম্মুখে "তপোবন" এই শব্দ লিখিত রহিয়াছে।

এ অঞ্চলে কেবল ফুল ফলের বাগানই অধিক, লোকের বসতি কম; মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ এক একটী গৃহস্থের বাসভবন দৃষ্ট হয়। তপোবনের চারিদিকে বৃক্ষকুঞ্জ। চূতশাখা সকল মুকুলভারে নত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মকরন্দলুব্ধ মধুমক্ষিকা এবং বিহঙ্গকুল গান করিতেছে, লেবু ফুলের মিষ্ট মিষ্ট সুগন্ধ আকাশপথে বহিয়া যাইতেছে, প্রেমোন্মত্ত কোকিল ও পাপিয়াদলের মুহুর্মুহুঃ ঝঙ্কারে বনরাজী নিনাদিত হইতেছে। মস্তকোপরি সুনীল গগন, তাহার তলে সুদূর বিস্তৃত হরিদ্বর্ণ ঘন নিবিড় বৃক্ষপত্রাবলী, তাহা ভেদ করিয়া নব রবির স্বর্ণময় কিরণচ্ছটা ভূমিতল রঞ্জিত করিয়াছে। শান্তি যেন তথায় মূর্ত্তিমতী। দিবাকর বাবু ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তৎকালে নিরঞ্জনা প্রাতঃকালীন পূজার জন্য কুটীরাভিমুখে যাইতেছিলেন। সহসা তাঁহাকে দেখিয়া তিনি উৎফুল্ল মনে আস্তে ব্যস্তে নমস্কার করিলেন এবং আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "আমার বড় ইচ্ছা ছিল আপনার আশ্রম এক দিন দেখি। আজ হঠাৎ এই পথে বেড়াইতে বেড়াইতে সৌভাগ্য ক্রমে আপনার দর্শন পাইলাম। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, যদি শ্রবণ করেন বড় বাধিত হই।"

নিরঞ্জনা যথোচিত সাদর সম্ভাষণের পর স্মিত মুখে মৃদু মধুর বচনে উত্তর করিলেন, "এক্ষণে আমাদের দৈনিক উপাসনার সময়, যদি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করেন, পরে শুনিতে পারি।"

দি। আমি কি উপাসনার স্থানে থাকিতে পারি না?

নি। ইচ্ছা করিলে অবশ্যই পারেন। ঐ অদূরে বেদীবেষ্টিত বৃক্ষ-মূলে আসন বিস্তৃত আছে, উহাতে উপবেশন করুন।

উপাসনার কুটীরমধ্যে আর তিন চারিটী বিধবা ভগ্নী বসিয়াছিলেন। আশ্রম প্রাঙ্গণের ভূমিতল এমনি পরিষ্কৃত, বৃক্ষ লতা এমনি সুন্দর রূপে সংরোপিত,

এবং উপাসনার স্থানটী এমনি সুরম্য, যে সেখানে গেলে সহজেই মনে ভক্তির উদয় হয়। ধূপ ধুনার গন্ধ এবং নানা জাতীয় পুষ্পগন্ধে এবং লতা পাতায় তপস্যাকুটীরটী যেন স্বর্গের শোভা বিস্তার করিতেছিল। এই স্থানে মধ্যে মধ্যে নগরবাসী ধর্ম্মপিপাসু নরনারীগণ আসিয়া থাকেন। কেহ কেহ সমস্ত দিন থাকিয়া যান। বিশেষতঃ বিশ্রাম দিবসে, রবিবারে অনেকেরই সমাগম হয়। সংসারজ্বালা নিবারণের পক্ষে এ স্থানটী বড়ই উপযোগী।

উপাসনা আরম্ভ হইল, একতন্ত্রী করতাল এসরাজ টেম্বরিন্ শঙ্খধ্বনি সহকারে নারীগণ সঙ্গীত করিলেন। আবার সেই মধুর কণ্ঠের মধুর স্বরলহরী, শ্রবণসুখকর সুমিষ্ট বাণী, সেই নীমিলিত কমল নয়নশোভিত কমনীয় মুখকান্তি। দেখিয়া শুনিয়া নিমেষের মধ্যে দিবাকরের হৃদয় প্রীতিরসে পরিপ্লাবিত হইল। আর সকলে চক্ষু বুজিয়া উপাসনা করিতেছে, তিনি নিরঞ্জনার তৎকালকার ভক্তিভাবপূর্ণ মুখশোভা অবাক হইয়া স্থির নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। প্রকৃতির মনোহর সৌন্দর্য্য এবং বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশির ভিতরে প্রকৃতির স্বর্গীয় লাবণ্যছটা, তৎসঙ্গে প্রকৃতির দেবতার পূজা বন্দনা, এ সমস্ত দর্শন শ্রবণে কাহার চিত্ত না বিমোহিত হয়?

এই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া এবং মধুর গম্ভীর স্তব স্তুতি গাথা বন্দনা প্রার্থনা সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আগন্তুকের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবরসের আবির্ভাব হইল। মরুভূমিতে শিশির পাতের ন্যায় তাঁহার শুষ্ক চক্ষে দুই এক ফোটা জলও পড়িল। সে ভাব তাঁহার পক্ষে অভাবনীয়। ইহা মনোবিজ্ঞানের কোন্ নিয়মের অন্তর্গত, কি নামে অভিহিত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু তাহার প্রভাবে প্রাণ বড় সুমিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। দিবাকর বাবু ইহাকে কবিত্ব কল্পনা বলিয়া বা ভাবান্ধতা বলিয়া আগে উড়াইয়া দিতেন, এক্ষণে বুঝিলেন, এ জিনিষ দরকারী, না হইলে চলে না, জীবন কঠোর নীরস হইয়া শুকাইয়া যায়, তাহাতে ফুল ফল ধরে না। ধর্ম্মকে তিনি এখন উচ্চতর কল্পনা কবিত্ব বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই মনোহারিণী কল্পনার সৌন্দর্য্য এবং এই কবিত্বের মাধুর্য্যের গূঢ় অভ্যন্তরে যে অটল অভ্রান্ত সত্য পদার্থ আছে সে দিকে তখন তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত হইল না।

উপাসনা ভাঙ্গিল, নারীগণ ভগবৎপ্রসাদ সম্ভোগে আরো সুন্দর রমণীয় মূর্ত্তি ধরিয়া বাহির হইলেন। তপস্যাকুটীর হইতে মৃদু পাদ বিক্ষেপে

যখন সকলে বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহাদের মুখশ্রীতে স্বর্গীয় শান্তির কোমলতা স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল। উপাসনা যে ঠিক হইয়াছে, মুখশ্রী তাহার প্রমাণ। তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধানা এবং প্রবীণা তাঁহার নাম অনুকম্পা। অনুকম্পা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কোন কষ্ট হয় নাইত? অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।"

দি। অনেক ক্ষণত বোধ হইল না। আধ ঘন্টা কি হদ্দ তিন কোয়ার্টার হবে।

অ। না, তার চেয়ে বেশী। আমাদের সচরাচর দেড় ঘন্টা সময় লাগে।

দি। তা হবে, কিন্তু এত ক্ষণ আমি যেন আর একটা রাজ্যে ছিলাম। বড় রমণীয় স্থান। সঙ্গীতগুলি বড়ই চমৎকার লাগিল। আপনারাই যথার্থ সুখী। আচ্ছা, আপনাদের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় কিরূপে?

নিরঞ্জনা ইঁহাদের দুই জনকে কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া বলিলেন, "আমি শীঘ্র আস্‌ছি।" এই বলিয়া তিনি গৃহের দিকে চলিলেন।

দিবা। আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনার সঙ্গেই যে আমার অনেক কথা আছে!

নি। একটু বসুন, শীঘ্রই আসছি, হরিণশিশুকে কিছু খাবার দিয়া আসি। আপনি ততক্ষণ দিদির সঙ্গে আলাপ করুন।

নিরঞ্জনার নয়নদ্বয় এই অল্প কথার অঙ্গে অপর্য্যাপ্ত আত্মীয়তা এবং মধুরতা ঢালিয়া দিয়া গেল। তাঁহার ভাবভঙ্গী, মুখের প্রসন্নতা, নয়নের দিব্য দৃষ্টি, পদ সঞ্চালন, কণ্ঠস্বর এবং বচনাবলী সমস্তই যেন কবিত্বরসসিক্ত বলিয়া দিবাকরের বোধ হইয়াছে। তাঁর দৃষ্টিতে নিরঞ্জনা যেন একটী কবিতাময়ী কাব্যসুন্দরী নারী।

অনুকম্পা বলিলেন, "খরচ পত্রের জন্য আমাদের বড় ভাবিতে হয় না। আমরা কয়েকটী ভগ্নী এখানে থাকি। কেহ স্ত্রীবিদ্যালয়ে, কেহ বা অনাথ বালক বালিকাবিদ্যালয়ে, কেহ কিণ্ডর গার্টেন স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করি। কেহ কেহ বা স্থানে স্থানে মহিলাদিগের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা এবং উপাসনাদি করিয়া থাকি। বিধাতার কৃপায় আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যায়।

দি। তাহাত বুঝলাম, কিন্তু কি প্রণালীতে হয়?

অ। শান্তিধামের এবং ব্রাহ্মসমাজের দয়ালু ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে সমস্ত ভার বহন করিয়া থাকেন।

দি। যা হউক, বড় কষ্ট হয়।

অ। না, কষ্ট কিছু নাই। দয়াময়ের আমাদের প্রতি বড় দয়া! আমরা বেশ সুখে আছি। কোন অভাব দেখিতে পাই না।

দিবাকর বাবুর বক্ষে সোণার ঘড়ি, সোণার চেন, দুই হাতে হীরার চারি পাঁচটা আংটি চক্ষে সোণার চস্‌মা, আর পরিচ্ছদও বেশ মূল্যবান। কথা কহিবার সময় তৎসমুদায়ের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। বলিলেন, "এটা বড় দুঃখের বিষয় যে, কাহারো প্রচুর ঐশ্বর্য্য, কিন্তু ভোগ করিবার লোক নাই; আবার কেহবা অর্থাভাবে মহা কষ্ট পাইতেছে।" এই বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। তদনন্তর একটু কি ভাবিয়া মলিন মুখে পুনরায় বলিলেন, "যাই হউক, বড় কষ্ট। আপনাদের অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় ক্লেশ বোধ হইতেছে।"

নারীগণ সকলেই সলজ্জ হাসি মুখে বিনম্র ভাবে বলিলেন, "বাস্তবিকই আমরা বড় সুখী। অভাব অতি অল্প,সুতরাং কোন কষ্ট বোধ করিতে পারি না। অভাব আমরা বৃদ্ধি হইতেও দিই না।"

দি। তা ঠিক বটে, অভাব বেশী থাকিলেই কষ্ট হয়, কিন্তু এমন এক-তলা সামান্য বাড়ীতে বিশেষ অসুবিধা হয় না কি? দরজা জানালা ছোট, শার্শি নাই, ম্যাটিং নাই, চেয়ার টেবিল সামান্য কাঠের, কৌচ সোফা নাই। (মনে মনে ইচ্ছা কিছু সাহায্য করেন। কিন্তু মুবব্বিআনার দয়ার হিসাবে।)

অ। এ দুঃখ বোধ হয় আপনার কল্পনার। আপনার কোথায় থাকা হয়?

দি। আমি অবিবাহিত, সুতরাং কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি সেটা ভুল। বিবাহ করিলে অর্থাগমের দ্বার খুলিয়া যায়, পলিটিকেল্ ইকনমিতে ইহাও বলিয়াছে। কারণ, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগ উদ্যম উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, মাথায় ভাব পড়ে, বুদ্ধিও খোলে। এখন আমি বিবাহ করিতে চাই। উচ্চ ষ্টাইলে খরচ পত্র এক রকম চালাইতে পারিব।

তাঁহার মনে হইল, বার জয়েন করিলে দুই এক হাজার টাকা মাসে আসিবে। আর পৈতৃক বিত্তের অংশ যা আছে তাও কিছু কম নয়। বিবাহ করাটাই শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছে। কারণ, তদ্ভিন্ন জীবনে কোন সুখ নাই। আত্মসম্ভোগই জীবনের লক্ষ্য, তাহাতে বঞ্চিত থাকা

আর মৃত্যু উভয়ই সমান। গুণবতী শিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রী বাস্তবিক সকল সুখের নিদান। কিন্তু আমি যাহাকে বিবাহ করিব তাহাকে ঘরকন্নার কাজ করিতে দিব না। দুই জনে এক সঙ্গে পড়িব, লিখিব, গাড়ী চড়িয়া নদীর ধারে পার্কে বেড়াব, থিয়েটার নাচ তামাসা দেখব। আহা বড় আমোদ কিন্তু। বেশ অমনি দক্ষিণে বাতাসে ফুলের গন্ধ আসছে, আর স্ত্রী পিওনা বাজাইয়া গীত গাইতেছেন, আর আমি তাঁর পাছে দাঁড়িয়ে চেয়ারের উপরে ঝুঁকে গান শুনছি, প্রশংসা করছি, হাসছি, এইত জীবনের সুখ।” নিমেষের মধ্যে এই সকল সুখের তরঙ্গ উঠিয়া মনেতেই তাহা মিলাইয়া গেল।

দিবাকর বাবু একটু নির্ব্বোধের মত বিবাহের ভাবগুলি আপনা হইতে বলিয়া ফেলিলেন। মনে মনে যাহা আন্দোলন করিতেন, তাহার কতকাংশ স্বাধীনভাবে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তপোবনবাসিনী ভদ্র মহিলাগণ নিকটে আছেন, সেটা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নারীসমাজে পুরুষেরা সাধারণতঃ বড় বোকা বনিয়া যায়। এই সকল সরল স্বভাবা বৃহদ্‌ব্রতধারিণী মিষ্টভাষিণী নারীদিগের সদ্ব্যবহারে, বিশেষতঃ নিরঞ্জনার সহাস্য আননের স্নেহরঞ্জিত সহানুভূতিমাখা মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলিতে বাবুটী বড় মজিয়া গিয়াছিলেন। তাঁর মনে হইয়াছে, বিবাহ করিব বলিলেই অনায়াসে পাত্রী জুটিয়া যাইবে। নিরঞ্জনাকে বলিলেই সে যেন হাত বাড়াইয়া বসিয়া আছে। এই ভ্রান্ত সংস্কারের বশীভূত হইয়া বিবাহের কথা কহিতেছেন। নিরাশ্রয়া বিধবাকে বিবাহ করিলে একটী দয়ার কার্য্য হইবে ইহাও মনে হইয়াছে। (যদিও তাহা পলিটিকেল ইকনমির বিরুদ্ধ।)

অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনিয়া চতুরা মহিলাগণ মুখ ফিরাইয়া একটু মৃদু হাস্য করিয়া গৃহাভিমুখে গমনোদ্যত হইল এবং বলিল, “আপনি বসুন, নিরঞ্জনা শীঘ্র আসিতেছেন।”

দিবাকর বাবু মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, “বেশ সুখে যে আছে, তা মুখ দেখিয়াই বুঝা যায়। আহা এক একটী যেন স্বর্গের পরী! অর্থ বিত্ত নাই, অথচ বনবিহঙ্গের ন্যায় নিশ্চিন্ত মানস, প্রফুল্ল চিত্ত। বিচিত্র বসন ভূষণ নাই অথচ অযত্নসম্ভূত অরণ্যকুসুমের ন্যায় মনোহর। পৃথিবীর এ সব ইকনমি কে রক্ষা করে? ভাবি আশ্চর্য্যত। আচার্য্য মিল্ ম্যালথাস্ বেন্থাম লুইস্ প্রভৃতি জ্ঞানীরা মাথা খাটাইয়া যা পারেন না, আপনাপনি তাহা কার্য্যে পরিণত হয় কোথা হইতে আমি বুঝিতে পারি না। স্বভাবে

ইকনমিত বেশ দেখি! কেহ অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী, কিন্তু বুদ্ধিতে যেন হনুমানের মত, হ্রস্ব দীর্ঘ কিছুই জ্ঞান নাই, পণ্ডিতের জ্ঞানের গৌরবের নিকট তার পৈতৃক ধনের কি কোন মূল্য আছে? ননী ছানা ক্ষীর সর মুর্গি মাটন লুচি সন্দেশ খাইয়া খাইয়া বড় মানুষের ছেলেটা যেন পাঁড় শশার মত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু না আছে তার গায়ে বল না আছে মনে বুদ্ধির প্রতিভা। ভদ্রের সভায় দাঁড়াইয়া দুইটা কথা সঙ্গত রূপে বলিতে পারে না। তার পুরু ঠোঁট, ফিঁকে চোখ, মোটা উদরটা যেন নির্ব্বুদ্ধিতার আধার! আর ঐ দেখ রোগা মড়া কাল কুচকুচে কেরাণীবাচ্চা, মুখে যেন ক্ষুরের ধার, চোখে যেন বিদ্যুতের প্রভা, বুদ্ধি যেন জ্ঞানের ভাণ্ডার। কোন ধনী বহু মূল্য সুবাসিত তৈল এবং বিবিধ উপকরণ দ্বারা কেশ বিন্যাস করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার চুল দিন দিন যেন মুড় খ্যাংড়ার মত হইতেছে; লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, সহস্র দাসী নিযুক্ত রাখিয়াও একগাছি চুল তিনি বাড়াইতে পারেন না। অন্য দিকে চাসার মেয়ে যে দুই হাতে গোবর ঘাঁটিতেছে, একটু নারিকেল তৈলেরও যার সংস্থান নাই, দেখ একবার তার চুলের গোছা! যেন শত সহস্র কাল ভুজঙ্গিনী মাথা হইতে পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে। কেমন তার চোখ মুখ কপালের গঠন। কেমন অঙ্গের সৌষ্ঠব। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি লাবণ্য! বা বা বেশ ইকনমি! এ রাজ্যে কাহারে অহঙ্কার খাটে না। রূপ গুণ কারো একচেটে নয়। গড়ে সকলে সমান সমান।"

এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময় নিরঞ্জনা ফিরিয়া আসিলেন। তিনি একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "আমায় ক্ষমা করিবেন, বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ একটা বিশেষ কাজে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

দি। সে জন্য কুণ্ঠিত হবেন না। আপনার দর্শন লাভজন্য যদি বহু বৎসর আমায় অপেক্ষা করিতে হয়, তাহাও আমি বেশী মনে করি না। (ইনি প্যারিস নগরে কিছু কাল ছিলেন, ফ্রেঞ্চ ভদ্রতা অনেক জানেন।) আর কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন?

নি। একটী গরিবের ছেলে পথে পড়িয়াছিল তাহাকে শুশ্রূষা করিয়া অনাথাশ্রমে পাঠাইলাম।

দি। আপনাদের কাজগুলি কিন্তু বড় পবিত্র। এই সঙ্গে থাকিতে আমার

বড় ইচ্ছা হয়। এইরূপ সৎকার্য্য করি আর উপাসনা করি, মনে বড় ইচ্ছা। আমাকে কিছু শিক্ষা দান করুন।

নি। আমরা সামান্য লোক, কিই বা জানি, কিই বা শিক্ষা দিব।

দি। আপনার সঙ্গে কোন একটা দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী থাকিতে পারি কি?

নি। যদি কাজ করেন অনেক কাজ আছে।

দি। আপনি যা বলিবেন আমি তাই করিব, অন্য কাজ আমি চাই না।

নিরঞ্জনা যা বলিবে, তাই দিবাকরের ধর্ম্ম, সে যা করিবে তাহাই তাঁর কর্ম্ম। চক্ষের চাহনি, মুখের ব্যাকুলতা, এবং কথার ব্যগ্রতা স্বরে নিরঞ্জনা তাঁহার মনের ভাব গতি কতক বুঝিলেন। তাঁহার ব্যবহার অতি সুকোমল, হৃদয়ে যথেষ্ট দয়া সহানুভূতি আছে, কিন্তু ইচ্ছা বড় অটল, প্রতিজ্ঞা বড় দৃঢ়, ঈশ্বরের আদেশে সমস্ত জীবন বাঁধা। যাহা হউক, যুবকের প্রতি তাঁহার দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসা যথেষ্ট হইল। কারণ, সে প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী এবং ভদ্র স্বভাব। যতই তিনি তাহাকে ভাল বাসিয়া আদর যত্ন করেন, ততই সে শরণাগত পদানত বিমোহিত হইয়া পড়ে। এমন কি মরিতে বলিলে যেন মরিতেও প্রস্তুত। যে বিষয়ে তিনি উপদেশ দেন, তাহাতে তার চক্ষে জল আসে, হৃদয় গলিয়া যায়, হাঁ ভিন্ন মুখে না কথা নাই। তার কাছে ধর্ম্ম প্রেম কবিত্ব ইহ পরকাল স্বর্গ পৃথিবী সব একাকার হইয়া গিয়াছিল।

পরে কিছু দিন ক্রমাগত তিনি তপোবনে যাতায়াত করেন আর এই ভাবে ভাবুক হইয়া নিরঞ্জনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। কিছু আর বলিতেও হইত না, ভাব গতি ইঙ্গিত বুঝিয়া তিনি নিরঞ্জনার ইচ্ছা পালন করিতেন। নিরঞ্জনা অবশ্য ইহাতে কুণ্ঠিত হইতেন। কিন্তু দেখিতেন, তাঁহার সন্তুষ্টি সাধন, অভিপ্রায় পালন করিতে পারিলে যুবক একবারে যেন কৃতার্থ হয়। লোকে কথায় বলে, ভগবান্ যিনি তিনিও সেবায় বশীভূত, নিরঞ্জনার ইহাতে যুবকের প্রতি স্নেহ মমতা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। সুতরাং তদনুসারে ব্যবহার আচরণও পরমাত্মীয়ের ন্যায় হইয়া উঠিল। এক দিন তিনি বলিলেন, "আপনার যেরূপ পরোপকার-প্রবৃত্তি প্রবল দেখিতেছি, "পতিতোদ্ধারিণী" আশ্রমে আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী

তত্ত্বাবধায়িকা আছেন, আপনি যদি তাঁহার সহকারী হইয়া বাহিরের কার্য্যাদির ভার লয়েন, আমি বড় সন্তুষ্ট হই। 'কিন্তু ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্যকে সে কাজ দেওয়া হয় না, কারণ ইহা ব্রাহ্মসমাজের অধীন। ব্রাহ্ম হইতে আপনার আপত্তি কি?"

দি। এখন কোন আপত্তি নাই।

দিবাকর ব্রাহ্মদলে নাম লেখাইয়া উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রাণপণে তাহাতে পরিশ্রম করিতেন। যে ভাবেই করুন তাহার বিচারে কোন প্রয়োজন নাই, সরকারী কাজত এখন চলুক। দিবাকর নিরঞ্জনার হাস্যমুখ, মধুর বাণী এবং সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পরের জন্য জীবন ধারণ যে কি সুখের বিষয় তাহাও কিছু কিছু বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু ইহার ভিতরে যৎ কিঞ্চিৎ আত্মপ্রবঞ্চনা ছিল। এক একবার মনে ভাবিতেন, "পরসেবায় কি এতই সুখ যে বিবাহ না করিয়া সন্ন্যাসির মত থাকা যায়? আত্মসুখ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দেওয়া বড় কঠিন।"

নবম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণ পক্ষীয় রজনী, চতুর্থী তিথির ক্ষয়শীল চাঁদ ভগ্নদেহ লইয়া আকাশে উদয় হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের ফটকে তিনটী লোক বসিয়া কথা কহিতেছেন, আর একটী লোক ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া বেঞ্চের উপর বসিলেন এবং সকলে বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এমন সময় সম্মুখের রাস্তা দিয়া যণ্ডরে মুসলমান মুটে দুই জন গলা ধরাধরি করিয়া "বঁধু হে কোথা যাও! তোমাতরে প্রাণ কেমন করে।" এই বলিয়া গান গাইতে গাইতে চলিয়াছে। চেটাল বুক, লম্বা লম্বা চুল, দীর্ঘ ছন্দ বলিষ্ঠ দুইটী নধর জোয়ান। তাহাদের জোরাল গলার ঘোরাল সুরে পথের ধারের বাড়ীগুল প্রতিধ্বনি সহকারে যেন কাঁপিতেছিল। বেঞ্চের উপর যে চারি জন বসিয়া আছেন তার মধ্যে এক জন বলিলেন, "এদের কেমন সরল সখ্যভাব দেখেছ? আমরা সভ্য জীব, সাহস করিয়া প্রেমের সহিত এ পর্য্যন্ত কেহ কাহারো গলা জড়াইয়া

ধরিতে পারিলাম না। আমাদের বন্ধুতা মনকে বড় কুণ্ঠিত করিয়া রাখে। মশায় মশায় করিতে করিতেই প্রাণ যায। ভাষার উন্নতি এবং পারিপাট্য কপটতা ও ভয়কে আরো যেন বৃদ্ধি কবিযাছে। পান থেকে চূণ খসিলে অমনি বন্ধু চটিলেন। ইহারা দেখ শালা বলিয়া সহজে সম্বোধন করে, এবং গালাগালি না দিয়া কোন কথা কয় না, কিন্তু তবু মুখোমুখী গলাগলি প্রেম। কোন বিকার নাই। সরলভাবে ঝগড়া কবে এবং ভাল বাসিবার সময় অকপটে ভাল বাসে। আমবা কৃত্রিম জীব হইয়া পড়িযাছি। কৃত্রিমতাই যেন স্বভাব। কৃত্রিম প্রণয়, কৃত্রিম ভদ্রতা, আপনাব প্রতিও আপনার কৃত্রিম ব্যবহার। কেন যে কৃত্রিমতা করি তাও ভুলিয়া গিযাছি। এত কাপট্যের মধ্যে কি প্রকৃত বন্ধুতা তিষ্ঠিতে পারে? হাসিবে তাও কৃত্রিম, কাঁদিবে তাও কৃত্রিম। কোন বকমে ভদ্রতা বক্ষা হইলেই হইল। মুখের সামনে ধন্যবাদ, অভিনন্দন, প্রশংসাবাদ, কিন্তু একটু চক্ষের আড়াল হইলে অমনি নিন্দা গ্লানি। কিন্তু কে যে আপনাব লোক, আব কাব কোন্ কথাটা যে সরল সত্য কথা, তাহা বুঝিবাব যো নাই। মিথ্যা কপটতা ক্রমে সত্য সারল্যের স্বভাব প্রাপ্ত হইযাছে।”

অন্য এক জন বলিলেন, “আব একটী কেমন মজা দেখেছ। সমস্ত দিন এরা ভূতগত পবিশ্রমেব পব কেমন আনন্দে হাসিযা খেলিয়া গান গাইযা বাসায় ফিবিতেছে।” তৃতীয ব্যক্তি বলিলেন, “আব আমবা এক ঘণ্টা উপাসনা করিযা যেন শ্মশান হইতে মড়া পোড়াইযা বাড়ী যাইতেছি।”

এই চাবি জনের মধ্যে এক জন সমাজমন্দিবেব কার্য্যাধ্যক্ষ, নাম মধুকর। দ্বিতীয়েব নাম গদাধর, ইনি চিন্তামণিব কনিষ্ঠ পুত্র, এখন ব্রাহ্মসমাজেব সভ্য হইযাছেন। তৃতীয দীনেশ চন্দ্র, বিশ্বম্ভবেব সহচর। চতুর্থ একটী সহৃদয ভদ্রযুবা, ইনি ব্রাহ্ম নহেন, কিন্তু একেশ্ববাদী ভক্তিমান ব্যক্তি। নাম বিরিঞ্চিকুমাব।

মধু। দীনেশ বাবু, উপাসনা উপদেশ কেমন সম্ভোগ কবিলেন?

দী। মন্দ কি! তবে বাহ্যাড়ম্বব কিছু বেশী বোধ হইল। কবিত্বেব প্রাচুর্য্য, জ্ঞানের গবিমা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত। সঙ্গীত স্তব প্রার্থনায় ভগবৎ আঘ্রাণ পাইলাম না।

বি। হেঁ, কেমন যেন শুকনো শুকনো, বস কস নাই। এতে মন ভেজে না। এর চেয়ে একা ঘরে বসে বেশ আনন্দ পাই।

মধুকর বলিলেন, "তবু কিছুত উপকারি হয়। রবিবারে অন্ত কথা আমোদে না মজে এক সঙ্গে সকলে সৎ কথা শ্রবণ করায় কিছু ফল অবশ্যই আছে।"

বি। আমি কিন্তু বিশ্বম্ভর বাবুদের প্রার্থনা উপাসনা উপদেশাদি শুনিয়া ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী উপকার পাই, হৃদয় তাহাতে বেশ গলে, মন মজে। প্রাণটা একটু খানি না ভিজিলে কি ভাল লাগে? মতামত তর্ক যুক্তি লইয়া কি হবে?

মধুকর বলিলেন, "গদাধর বাবু যে কিছু কথা কহিতেছ না? তোমার মত কি এ বিষয়ে? তুমিত এক জন নবানুরাগী উৎসাহী উপাসক।"

গ। আমি মশায় স্পষ্টবক্তা, অত ঘোর পেঁচ বুঝি না। বড় দাদার মুখে যে সকল ধর্ম্মের কথা শুনি তা যেন হৃদয়ে লাগে, মনে বল শক্তি পাই; আর এ সকল কোথায় উড়ে যায়।

দী। তার মানে, মানুষের পানে চেয়ে তৃতীয় পুরুষে উপাসনা, আর ঈশ্বরের পানে চেয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজ জীবনের উপাসনা, দুয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। উপাচার্য্য মহাশয় যখন আরাধনা ধ্যান প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাঁর মুখের ভাব ভঙ্গিতে বোধ হইল, দৃষ্টিটে সম্পূর্ণই মানুষের দিকে।

বি। মধুকর বাবু যদি রাগ না করেন স্পষ্ট বলি। আসল কথা এই যে, প্রতিমা খানি গড়িয়া চিত্র করিয়া সাজাইয়া ঠিক করা হইয়াছে, কেবল প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

গ। ঠিক বলেছ ভাই। আর ভাল লাগে না। একেত নিরাকার দেবতা, তাতে যদি কেবল মুখের বচন মাত্র পূজার উপকরণ হয়, তবে ভাল লাগিবে কেন? ব্রাহ্মসমাজে আজ কাল কেবল কথার শ্রাদ্ধ।

ম। মনে ভাব আসিলে কথা কি চেপে রাখা যায়?

দী। আমার তা ত বোধ হয় না। মনে হয় সব ফাঁকা আওয়াজ, একটা ছিটে গুলিও নাই।

গ। ঠিক বলেছেন দীনেশ বাবু। গুলি থাকিলে দুই একটা আওয়াজেই মানুষ ঘাল হয়ে পড়ে।

দী। এখানে অনেক বকিবার তাৎপর্য্য এই যে, পদার্থ কম। সুতরাং ভাষা সব ভেসে যায়। সারত্বও নাই, ভারত্বও নাই।

মধু। তবু ভগবৎ প্রসঙ্গ বটে!

দী। তা কই? কেবল মতগত বুদ্ধির কথা। জীবন চাই; বিশ্বাসী ভক্তের জীবনের কথায় জীবন তৃপ্ত হয়, চরিত্র গড়ে, তাঁহার হৃদয়ের সরল ভাব অন্য হৃদয়কে স্পর্শ করে। আপনাদের এ এক প্রকার যাত্রা থিয়েটর? তাল মান বেশ দোরস্ত।

মধু। এই সব লোক যে আসে, এরা কি কেবল গোটা কতক বৃথা কথা শুনে যায়? আমি এ কাজে বিশেষ উপকার পাই। শত শত লোক ব্রহ্মের পূজা করিতেছেন, আহা কেমন আনন্দ! আমি তাঁদের ভৃত্য হইয়া পূজার আয়োজন করিয়া দিতেছি। এই চিন্তাতেই কত সুখ!

দী। প্রকৃত পূজা হইলে তা সত্য; কিন্তু সে কেবল আপনার নিজ-গুণে। বস্তুতঃ এখানে ব্রহ্মপূজা হয় না। শান্তি শান্তি শান্তি শেষ হইতে না হইতে উপাচার্য্য মহাশয় বলিতেছেন, "কেমন শুন্‌লেন।" কথার স্বরে, মুখের চেহারায় যেন অহঙ্কার একবারে মূর্তিমান। শ্রোতাগণও তেমনি। পাশে বসিয়া দুটী লোক হাসিয়া হাসিয়া কেবলই ঠাট্টা সমালোচনা করিতেছিল। বক্তা এবং শ্রোতার ভিতর ব্ল্যাচ্‌ফ্যামির প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আমি বড় ব্যথিত হইয়াছি।

ম। কি! ব্ল্যাচ্‌ফ্যামি। দীনেশ বাবু, আপনি এমন শান্ত স্বভাব ব্যক্তি হয়ে এত বড় কঠিন কথাটা বলে ফেল্‌লেন?

দী। যদি কঠিন হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন। কাহারো অবমাননা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু উপাচার্য্য যে কথা গুলি বলিলেন, বোধ হইল সব মিথ্যা কথা। আগা গোড়া কেবল মানুষের দিকেই দৃষ্টি।

ম। তাইত! এটা যে বড় বেজায় কথা হচ্ছে। আচ্ছা, এবারকার উৎসবের সময় কি আপনি ছিলেন?

দী। মাঝে মাঝে এসে দেখিছি।

বি। বিশেষ কি উন্নতি তাতে প্রকাশ পেয়েছে?

ম। উন্নতি নয়, বলেন কি? কত লোকসমারোহ, ভাত দিয়ে কুলাইতে পারি না। নগরকীর্ত্তনে খোল কর্ত্তাল নিশান তুরী ভেরীতে একবারে খেচা খেচি। নিশানই কত! আর কত রঙের! ভক্তগণের উৎসাহ দেখলে প্রাণ মত্ত হয়! কেবলই হাত তুলে তুলে নৃত্য আর গীত, দিবানিশি বিশ্রাম নাই, চোখে মুখে যেন আগুণ ছুট্‌ছে। আর আচার্য্য মহাশয় উপদেশ দিয়ে লোককে কাঁদিয়ে ছেড়েছেন।

দী। আপনি মুসলমানদের মহরম উপলক্ষে পাঠান মোগলদের বুক চাপড়ান লাঠিখেলা দেখেছেন কি?

ম। দীনেশ বাবু, বিদ্রূপ করাটা কি ভাল হচ্ছে? আপনাকে আমরা বিশেষ মান্য করি। মুসলমানের হোসেন হাসেন আর আমাদের উৎসব কি সমান?

গদাধর কিছু গোঁয়ার গোছের লোক, ভাব চাপিয়া নির্দ্দোষ ভাষায় মতামত প্রকাশ করিতে জানে না। যত বড় তার ভাব তত বড় কথা। মূর্ত্তিটী পালোয়ানের মত, কথাগুলিও প্রস্তর খণ্ডের ন্যায়। মোটা মোটা স্বরে উচ্চ শব্দে সে বলিল, "আপনাদের সমাজ কেবল পরস্পরের সন্তোষ সাধনের জন্য। লোকের পূজা, আত্মপূজার লৌকিক ধর্ম্ম, ভগবানের দিকে দৃষ্টিই নাই। অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বাহ্য জাঁক জমক অনেক হইয়াছে, এখনও আছে। মিছে কেন জাঁক করেন। আপনাদের পদার্থ কিছুই নাই। কেবল ভ্যারেন্দা ভাজা সার। আগে জানিলে আমি যোগ দিতাম না।"

গদাধরের গদাঘাততুল্য অন্তর্ভেদী কথা শুনিয়া মধুকরের আর সাহস হইল না যে উত্তর দেন। মুখ ম্লান করিয়া আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চলিলেন। দীনেশ বাবু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের জাতীয় প্রকৃতি যাহা চায়, বিশেষতঃ মানবস্বভাবের যাহা গভীর অভাব, তাহা ইহা দ্বারা পূর্ণ হইবে না। জাতীয় ধর্ম্ম জাতির শোণিতের সঙ্গে মিশা চাই। শুষ্ক নির্গুণ ধর্ম্মতত্ত্ব, বুদ্ধির শুষ্ক মতামত বা বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভাবান্ধতার ধর্ম্ম, এ তিনই অসার। আধ্যাত্মিক সার ভাবের সঙ্গে বাহ্য ক্রিয়ার তেমনি-যোগ যেমন আত্মার সঙ্গে শরীরের। এ সমস্ত আধ্যাত্মিক রাজ্যের ব্যাপার; খুব মনঃসংযম ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আত্মত্যাগ বিশ্বাস ভক্তি ভিন্ন ইহার তত্ত্ব অনুভব করা যায় না। সাধে কি আর প্রাচীন ঋষিরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য বনচারী হইতেন? জড়াসক্ত চঞ্চলমতি লোকের এ কাজ নয়।"

মন্দিরের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় বলিলেন, "অদ্য যে আমিত্ব বিনাশের উপদেশ দেওয়া হইল ইহা অপেক্ষা আর উচ্চ ধর্ম্ম কি হইতে পারে? আমিত্ব বিনাশ হইলেই ভগবানের প্রেরণা আসে। পাত্র খালি হইলেই তাহা বাতাসে পূর্ণ হয়।

দী। আমিত্ব বিনাশ হইলে ত? তা হয় কৈ? উপদেষ্টা মহাশয়

অহঙ্কার বিনাশের কথা বলিলেন, অথচ তাঁহার কথার স্বরে, নয়নের ছটায়, ভাব ভঙ্গীতে অহঙ্কার যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বিনয়ের মধ্যেও তমোগুণের দুর্গন্ধ। অহং বিনাশ জীবনে, কথায় নহে; ব্যবহারে, উপদেশ বক্তৃতা বা বাক্যে নহে। এ সব জিনিষ ঘ্রাণে টের পাওয়া যায়।

গ। মহাশয়, এদের মানুষই সর্ব্বস্ব। যদি লোক বেশী হয়, বক্তৃতা উপাসনা উৎসাহপূর্ণ হইবে; কম হইলে নমঃ নমঃ করিয়া সারেন। ভগবানকে সাক্ষী গোপালের মত একবার ডেকে মানুষের দিকে চেয়ে কেবলই বাগ্মিতা।

দী। কেবল মানুষের প্রতি চাহিয়া ধর্ম্ম করিলে এইরূপই হয়। লোকের অনুমোদনের জন্য মনের কাণ যেন খাড়া হইয়া থাকে। এই জন্য দুই চারি জন সদলের লোক থাকে তাহারা বাহবা দেয়, আর অমনি বক্তার বুক ফুলিয়া উঠে।

ম। যথার্থ বলেছেন মহাশয়! যাত্রাওয়ালারাও অমনি করে। আপনারাই নাচে গায় আবার নিজেরাই বা। বা। ক্যা বাৎ ক্যা বাৎ! বেশ বেশ। বলে।

দী। মানবীয় ধর্ম্ম আর স্বর্গীয় বা ঈশ্বরীয় ধর্ম্ম ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্।

গ। আমি অত সূক্ষ্ম বুঝিতে পারি না, মূর্খ সূক্ষ্ম লোক, কিন্তু কেমন যেন ফাকা ফাকা বোধ হয়, প্রাণ হু হু করে। কেবল সামাজিক গোল আর বাহ্য কাজ লইয়া কি ধর্ম্ম থাকে? আত্মাতে তেজ, হৃদয়ে ভাবরস যাতে জন্মে তাহা কর, নৈলে আমি বৈষ্ণবদলে মিশিব। এরূপ বাবুগিরি সভ্যতার ধর্ম্ম থাকা না থাকা সমান।

বিরিঞ্চি বাবু নিরপেক্ষ লোক, তিনি বলিলেন, "আপনারা বিশ্বম্ভর বাবুকে ইহার মধ্যে এনে ফেলুন বেশ কাজ হবে।"

চৌমাথায় দাঁড়াইয়া এই সকল কথা হইল, পরে বিরিঞ্চি বাবু অন্য পথে একা বাড়ী গেলেন।

ম। দলের বাহিরে থাকিলে কি এ সব বুঝা যায়! বিরিঞ্চি বাবু আমাদের ধরি মাচ, না ছুঁই পানি। কেবল ফাঁকি দিবার চেষ্টা। আর স্ত্রীর চরণ সেবা।

দীনেশ বাবুও অন্য পথে বাড়ী চলিয়া গেলেন। তখন মধুকর বাবু গদাধরকে উপদেশ দ্বারা দলে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন। এবং দুই জনে দীনেশ বাবুর কি কি দোষ আছে তাহা হাস্যামোদের সহিত

সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে পরস্পর দুই জনের মধ্যে ভাব ও প্রণয়ের অভাব, সেখানে তৃতীয় পুরুষের শ্রাদ্ধটা সদালাপের বিষয় হইয়া থাকে। আবার তৃতীয় পুরুষের সঙ্গে দেখা হইলে দ্বিতীয় পুরুষের সপিণ্ড-করণ আরম্ভ হয়।

ব্রাহ্মসমাজের শুষ্ক নির্জ্জীব অবস্থা, অন্তঃসারবিহীন বাহ্যাড়ম্বরের কথা এ সময় যেখানে সেখানে আলোচিত হইত এবং প্রধান সভ্যগণ তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

এ সময়কার ব্রাহ্মসমাজের কথা বলিতে হইলে সাধারণ ভাবে এ দেশের ধর্ম্মের অবস্থা কিছু আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। পাঠকগণ হয়ত মনে করিতেছেন, বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম একবারে কেন সম্পূর্ণ এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল না? তাহা সম্ভব নহে, পরিবর্ত্তনের গতি অতি ধীর। ঊনবিংশ শতকে আমি যে অবস্থা দেখিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। জনসাধারণ, অল্পবুদ্ধি নরনারী সেই কুসংস্কার বাহ্যপূজা, জড়োপাসনা লইয়াই আছে। ইহারা যুগে যুগে একই অবস্থার দাস। গতানুগতিক ধর্ম্ম বংশান্তরে একবারে রূপান্তর হয় না। প্রতি বংশে দুই চার জন দশ জন করিয়া তাহা ছাড়িতে থাকে। বহু পূর্ব্বকালে প্রাচীন আর্য্যগণ প্রতিভা-বলে কবিত্ব কল্পনার সাহায্যে যে সকল মনঃকল্পিত সাধু এবং অদ্ভুত চরিত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থে দেবতা বা ঈশ্বরাকারে আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, এবং কর্ম্ম-কাণ্ডের যে বিধি দিয়াছিলেন, সহস্র সহস্র বৎসর ক্রমাগত বংশপরম্পরায় তাহারই পূজা চলিয়া আসিতেছে। সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের অনেকের ক্ষমতা নাই, অনুরাগও নাই। বাল্যসংস্কার বশতঃ পুরাতন প্রথা এক প্রকার রমণীয় বোধ হয়, তাই কেহ তাহা ছাড়িতে পারে না। একটা কোন রকম থাকিলেই হইল; ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য, সুতরাং ঢেঁকি ভজিয়াও কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, এই তাদের বিশ্বাস। ঈশ্বর অনন্ত মহান্ নিরাকার তাঁকে কেইবা বুঝিতে পারে? ব্রহ্মজ্ঞান আর পুঁতুল পূজা কার্য্যতঃ মানবজীবনে একই অবস্থায়

সৃষ্ট হয়। . সুতরাং অনন্ত নিরাকারকে কেহ ত ভাবিতে বা আয়ত্ত করিতে পারে না। আর একটা দেবচরিত্র জড়মূর্ত্তি নর উপলক্ষে যদি মানুষ সাধু সচ্চরিত্র হইতে পারে, তাতেই বা ক্ষতি কি? এই ভাবিয়া অনেক শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তিও প্রচলিত সাধারণ ধর্ম্মের প্রতি শেষ বয়সে পক্ষপাতী হন। অধিক কথা কি দেখিতে দেখিতে আমার চক্ষের সম্মুখে কোন কোন সাধক উপাস্য দেবতার পদবীতে আরোহণ করিলেন। বঙ্কিম বাবু কবিত্ব কল্পনার বলে স্বীয় কাব্য গ্রন্থে যে কয়টী ভাল ভাল চরিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখন পৌরাণিক দেবতা রূপে কোন কোন স্থলে গৃহীত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আর কতকগুলি লোক আছে তাহারা বুজুরকির অদ্ভুত কার্য্যকেই ধর্ম্ম মনে করে। ধর্ম্মের নামে কত অসারতা ভ্রান্তি কল্পনা, স্বার্থপরতা কত রহস্য-জনক মত অনুষ্ঠান, কত পশুত্ব এবং পৈশাচিক ব্যবহারই প্রচলিত হইয়াছে!

হিন্দু সমাজের এক শ্রেণীর নরনারী পূর্ব্ববৎ স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া আসিতেছেন। জ্ঞানী শিক্ষিতের মধ্যে অধিকাংশ না হিন্দু, না মুসলমান, বাকী দুই চারি জন জ্ঞানান্ধ এবং নবকুসংস্কারাপন্ন এবং একেশ্বরবাদী; ভক্ত প্রকৃত ভক্ত জ্ঞানী কেহই নাই বলিলেই হয়। কেহ কেহ একেশ্বরবাদী সংস্কৃত হিন্দু। তাঁরা সামাজিক এবং পারিবারিক ক্রিয়া উপলক্ষে পুঁতুল পূজা করেন, কিন্তু তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা এক নিরাকার ব্রহ্ম, অন্তরে অন্তরে উপাসনা প্রার্থনা তাঁহারই নিকট করিয়া থাকেন।

দশ সহস্রের মধ্যে এক জন জ্ঞানী, হাজার জ্ঞানীর মধ্যে এক জন উপাসনাশীল সাধক, শত সহস্র সাধকের মধ্যে এক জন সিদ্ধ ভক্ত যোগী।

এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের পতন এবং উত্থানের ইতিহাস কিঞ্চিৎ তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ইহার ভিতর জীবন্ত বিধাতার জীবন্ত লীলা অনেক দেখিতে পাইবে। ইহাই এখন ভারতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির আশার স্থল। এই জন্য ইহার বিষয় বাহুল্যরূপে কিছু কথিত হইবে।

রাজা রামমোহন রায়ের তীরোভাবের পর অর্দ্ধ শতাব্দীমধ্যে পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানিগণ যখন হিন্দুসমাজে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মুমূর্ষু প্রায় জীবিত আছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বধামে গমন করিয়াছেন, হিন্দুসমাজ পৌরাণিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য শেষসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম্ম বদ্ধ জলের ন্যায়, মুসলমানেরা আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট, সেই কালে ব্রাহ্মসমাজ তিন ভাগে বিভক্ত হইল।

যিনি এক ঈশ্বর, এক শাস্ত্র, এক সাধন, এক সমাজ, এক পরিবার প্রতিষ্ঠার জন্য আসিলেন, তিনি নিজেই নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। যতই এক করিবার চেষ্টা হয়, ততই ভাগ্ ভাগ হইয়া যায়। সকলেই বলে, "আমরা পৃথিবীকে এক পরিবার করিব, কোন প্রকার ভেদাভেদ রাখিব না; এক ঈশ্বর আমাদের পিতা, নরনারী সমস্ত ভাই ভগিনী।" কিন্তু কাজে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিল। সাম্প্রদায়িকতা মনুষ্যের হাড়ের মধ্যে বাস করিতেছে, পুরুষানুক্রমে তাহা চলিয়া আসিতেছে, মুখে বলিলেই শীঘ্র কি তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে? মুখ বলে উদারতা ভ্রাতৃভাবের কথা, পুরাতন অভ্যাস আপনার নির্দ্দিষ্ট রেখার একটু এদিক্ ওদিকে যাইতে চাহে না। শেষ সকলে ভাঙ্গিয়া বলে গড়িতেছি, ভাগ করিয়া বলে এক করিতেছি। গোড়াতেই সেই পুরাতন ভুল রহিয়া গেল।

অনন্ত গোলমাল, কোথায় কিরূপে কি সূত্রে মিলন হইবে তাহা ভাবিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। একেত মানবস্বভাব বিচিত্র,—উপাদান এক হইলে কি হয়? প্রত্যেকেই ভিন্ন প্রকৃতি; ঈশ্বরজ্ঞান, ঈশ্বরানুভূতি, নীতিবোধ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, তাহাতে সকলেই স্বাধীন; গুরুবাদ নাই, অভ্রান্ত ধর্ম্মপুস্তক নাই, মতামতের একটা পরিষ্কার সাধারণ সিদ্ধান্ত নাই, এক জন প্রচারক যদি এক কথা বলে, আর এক জন তাহা কাটিয়া দেয়; যার যেমন বিদ্যা সে তেমনি মত ব্যাখ্যা করে, এবং প্রত্যেকেই বলে আমি অভ্রান্ত। অভ্রান্তে অভ্রান্তে বিবাদ কখন মীমাংসা হইবার নহে, মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহার সীমা। বুদ্ধি যুক্তি সকলেরই অধিকৃত।

এ অবস্থায় সমাজ মণ্ডলী পরিবার গঠন এবং এক ধর্ম্ম সাধন কিরূপে হইবে? ভবিষ্যদ্বংশইবা কি শিক্ষা পাইবে? বড়ই কঠিন সমস্যা। উদারতার প্রশস্ত ভূমিতে ছাড়িয়া দিলে কাহাকেও আটকিয়া রাখা যায় না, আবার বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিলে ঢুঁশোঢুঁশি লাগে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। তবে মিলনের সাধারণ ভূমি কোথায়? অনন্ত আকাশ "কোথায়" বলিয়া প্রতিধ্বনির সহিত সে কথা ফিরাইয়া দেয়। ভবিষ্যদ্বংশের জন্য, দেশের জন্য, পৃথিবীর জন্য, সমস্ত মানবজাতির জন্য যে ধর্ম্মের আবির্ভাব হইল তাহার ভিতর এ কি অনন্ত গোলমাল! ব্রাহ্মেরা কি রাখিয়া গেলেন, কিই বা রাখিয়া যাইবেন?

সামঞ্জস্যই ধর্ম্ম, এই কথা বড় বড় মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছিলেন,

একক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম নববিধানও তাঁহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া উপদেশ দিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে সেই পুরাতন একদেশদর্শিতা, আত্মরুচি, বিশেষত্ব, ব্যক্তিত্ব, আত্মাভিমান সাধারণ ভূমিতে আসিয়া মাথা ঘুরাইতে লাগিল। স্বায় সত্যের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব কিছুতেই মিশ খাইল না। যাঁর জ্ঞানপ্রধান স্বভাব তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই বুদ্ধির দিকে গড়াইয়া পড়েন। যিনি ভাবুক ভক্ত তিনি নানাবিধ কল্পনা কুসংস্কার গোঁড়ামি আনিয়া গোল বাধান। যিনি উদার তিনি কোন বন্ধনের ভিতর আসিতে চাহেন না। যিনি নিয়মনিষ্ঠ বৈরাগী তিনি কঠোর দুর্ম্মুখ কটুভাষী অহঙ্কারী। যিনি কাজের লোক তিনি ধ্যান যোগ উপাসনা ভজন পূজনকে অলসের বিলাস বলিয়া নিন্দা করেন। যিনি সাধক যোগী ভক্ত তিনি জ্ঞানী কর্ম্মীকে ঘৃণা করেন। যিনি রক্ষণশীল তিনি প্রাচীন প্রথা ছাড়িতে চাহেন না, নূতন সংস্কারকার্য্যে বাধা দেন। যিনি উন্নতিশীল তিনি হঠকারী হইয়া অন্ধ মদ্যপায়ীর ন্যায় বেগে ধাবিত হন। সর্ব্বোপরি প্রবৃত্তি আসক্তি এবং অহং জ্ঞান সকলেরই তলে তলে বসিয়া আছেন। এই সকল পরস্পরবিরোধী স্বভাব জীবকে এক ধর্ম্মে এক সমাজে বাঁধিতে হইবে। যখন ভাবভক্তি ধর্ম্মানুরাগ সাধুতা প্রবল থাকে তখন মিলন সম্ভব বোধ হয়, কিন্তু পরক্ষণে সেই অনন্ত গোলমাল! ধর্ম্মশক্তি ভক্তির মত্তত; উৎসাহের আগুনে যদি এ সকল গোলমাল জঞ্জাল পড়ে, পুড়িয়া এক হইয়া যায়, কিন্তু তাহা কে যোগাইবে? অগ্রগামী পথপ্রদর্শক ভক্তদল কৈ? শক্তির সামঞ্জস্যের অভাবে ব্রাহ্মসমাজে ঘোর বিড়ম্বনা উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধের সহিত যুবার, পুরুষের সহিত নারীর, বালকের সহিত বালকের মতে মিল হয় না। সকলেই লম্বা লম্বা বক্তৃতা করে, তর্ক করে, শাস্ত্র যুক্তি দেখায়, মুখে কেহই খাট নয়। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ এবং ভ্রাতৃপ্রেম উভয়ই শেষ ঈশ্বরাদেশ হইয়া দাঁড়াইল।

এক মতে এক নিয়মে সভার সভ্য সকলকে বাঁধিবার উদ্যোগ দেখিয়া কেহ গেরুয়ার খিলকা পরিয়া নখ চুল দাড়ি রাখিয়া ফকীরের বেশে দূরে পলাইল, কেহ ধুনি জ্বালাইয়া বাঘছালে বসিয়া কাণে মন্ত্র ফুঁকিতে লাগিল, কেহ নিশ্বাস রোধপূর্ব্বক বিকৃত স্বরভঙ্গীর সহিত রাধাকৃষ্ণের গীত গাইল, কেহবা ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়া মন্ত্রবলে রোগ ভাল করিতে লাগিল; কেহ হিন্দু, কেহ খ্রীষ্টিয়ান, কেহ বৈষ্ণব হইয়া গেল। কার সাধ্য যে পাঁচটা মাথা

এক জায়গায় করে? ধর্ম্মসমন্বয়কারী ব্রাহ্মগণ ঈশার সঙ্গে চৈতন্য, মুসার সঙ্গে জনক, শাক্যের সহিত মহোম্মদকে ভ্রাতৃপ্রেমে বাঁধিয়া নাচাইলেন, বাইবেল কোরাণের সঙ্গে বেদ ভাগবত মিলাইলেন, স্বর্গ মর্ত্ত্য ইহ পরকাল এক করিয়া দেশ কালের ব্যবধান ঘুচাইলেন, কিন্তু নিজেরা স্বদেশী স্বধর্ম্মী চিরপরিচিত দশ জনে এক হৃদয় হইয়া প্রেমপরিবার স্থাপন করিতে পারিলেন না। পুনঃ পুনঃ গোড়া পত্তন দিতে দিতেই জীবন শেষ হইয়া গেল। ঈশ্বরের পদতলে দুইটী আত্মা এক হইলে কি আনন্দ এবং সুখ হয় তাহা কাহারো ভাগ্যে ঘটিল না। পরিশেষে "আমাকে কেহ লইল না" এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে একে একে সকলে পরলোকে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মসমাজে পরোপকারী সচ্চরিত্র জ্ঞানী পণ্ডিত উৎসাহী ভক্ত লোকও অনেক ছিল। যখন ইহারা এক সঙ্গে উপাসনা সঙ্কীর্ত্তন এবং শাস্ত্র পাঠ করিত, উপদেশ দিত, কিম্বা একত্রে ধর্ম্ম প্রচারে বাহির হইত এবং প্রাণপণে দেশের বহুবিধ হিতকর অনুষ্ঠানে নিস্বার্থ ভাবে জীবন ঢালিয়া দিত, তখন যেন স্বর্গের ছবি। আহা কি মধুর তান লয় বিশুদ্ধ সুললিত সঙ্গীত! উপাসনায় মগ্ন ভক্তবৃন্দের কি অনুরাগপূর্ণ মুখশ্রী, এবং ভক্তিঅশ্রুবিগলিত নয়ন। সেবকগণের কি আগ্রহ ব্যাকুলতা বিনয় সৌজন্য। সাধকদিগের কি সুন্দর প্রার্থনা এবং রোদন ধ্বনি। দেখিলে শুনিলে আর সে সঙ্গ ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। আবার ভক্তে ভক্তে কেমন প্রেমালিঙ্গন, দণ্ডবৎ প্রণিপাত, শ্রদ্ধা প্রীতি সেবা ভালবাসা। যেন একাত্মা একহৃদয়। কিন্তু যখন ইহারা গৃহবিবাদে মত্ত হয় তখন আর এক মূর্ত্তি ধারণ করে।

ভাবী শান্তিনিকেতনের সমস্ত মাল মসলা সংগৃহীত হইয়াছিল, ভ্রাতৃ-প্রেমরূপ চূনের অভাবে দুই খান ইট এক সঙ্গে জমাট বাঁধিল না। ঘরের ভিত্তি না কি বিধাতার স্বহস্তের গাঁথা, তাই গোড়াটা কেবল রহিয়া গেল। গৃহভঙ্গের জন্য সকলেই দুঃখিত ব্যথিত, প্রত্যেকেই বলেন, "আহা একদল হইলে কি মহাশক্তিই হয়!" অথচ দল বানাইতে ছাড়েন না। সন্তানগণের লীলা খেলা দেখিয়া পিতা ভগবান্ আড়ালে বসিয়া হাসিতেন! বলি ঠাকুর, এ কি তোমরা মজা দেখ না কি? যদি পৃথিবীতে স্বর্গধাম আনিতে চাও, তবে সমস্ত গণ্ডগোল তুমি কেন নিজে মিটাইয়া দেও না? তা দিবেন না; তা হলে যে লীলা হয় না। যদি তাই দিবেন, তবে একবারে কেন মানুষকে

দেবতা করিয়া পাঠাইলেন না? হাড় জ্বালাতন করিবেন। নাকের জলে চোখের জলে করিবেন। আচ্ছা, তবে তাই করুন। "তুমি আমার আমি তোমার" এইটী বুঝি ভাল করিয়া শিখাইতে চান? মানুষে মানুষে বেশী ভালবাসা হইলে পাছে লোকে তাঁকে ভুলিয়া যায়, তাই বুঝি একটা ঈর্ষা আছে?

হায়! উনবিংশ শকের অন্তিম কালের ব্রাহ্মগণ! যদি তোমরা একবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে দেখিতে, তোমাদেব দৃষ্টান্তের কি বিষময় ফল ফলিযাছে। তোমাদের নির্দ্দোষ ভবিষ্যদ্বংশগণ এখনও পর্য্যন্ত তজ্জন্য কতই না ক্লেশ ভোগ কবিতেছে! আহা! আপনাদেব উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যের ফলাফলের জন্য তোমরাও কত দুঃখ ভোগ কবিযা গিযাছ। একটু যদি তখন দূরদর্শিতার সহিত তোমবা ভাবিযা দেখিতে, তাহা হইলে বোধ হয় গোঁ ধরিযা নিজ নিজপথে চলিতে পাবিতে না। হায়! সেই তোমাদিগকে মবিতে হইল, প্রভুত্বপ্রিয়তা মান মর্য্যাদা আত্মগরিমা কিছুই কাজে আসিল না। সে জন্য এখন ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তোমাদেব নামে লজ্জিত হইতেছে। তোমরা গড়া জিনিষ ভাঙ্গিতে বেশ মজবুদ ছিলে, কিন্তু গড়িতে পারিতে না! একটা অপমানের কথা সহ্য হইত না। একা একা মরিব তবু কারো সঙ্গে মিলিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিযাছিলে। ইহাব স্রোত ফিরাইবাব জন্য আমার প্রাণসখা শ্রীমান ভগবানচন্দ্রকে এখন কতই না পরিশ্রম কবিতে হইবে! সুখেব নববৃন্দাবন রচনাব জন্য ভক্তসঙ্গে আরও কত দিন তাঁহাকে খাটিতে হইবে তাহা কে বলিতে পারে? হায! প্রাচীন ঋষি যোগী ভক্ত মহাপুরুষগণ। ঈশা গৌর শাক্য মহোম্মদ, রামমোহন দেবেন্দ্র, কেশবচন্দ্র! তোমাদের মহজ্জীবনেব পবিত্র কার্য্য কি নিষ্ফল হইবে? যে সকল সৎকীর্ত্তির জন্য মহাত্মারা জীবন পাত করিয়া গিয়াছেন তাহা কি আর পুনর্ব্বার জাগিয়া উঠিবে না? আহা সেই মধুর উৎসবানন্দ, ভক্তের মেলা, প্রেমেব খেলা, ভাবেব মত্ততা এখনো আমাব মানসনেত্রে বিরাজ করিতেছে। সে স্বর্গের ছবি কোথায় লুকাইল। হে লীলারসময় হরি, সে উপাসনা সংকীর্ত্তন, সৎপ্রসঙ্গ, সাধনানুরাগ আর কি ফিরিয়া আসিবে না? যা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে পরলোকবাসী প্রাচীন সাধু ব্রাহ্মগণের প্রেতাত্মার মঙ্গল হউক! ভক্তবৎসল দয়াল হরি তাঁহাদের উন্নতি এবং পরিত্রাণ বিধান করুন। এবং বর্ত্তমান বংশকে তিনি নূতন করিয়া পুনর্ব্বার নিজহস্তে গঠন করুন।

যে যে কারণে এইরূপ গৃহবিচ্ছেদ বলক্ষয় উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সকলের জানিয়া রাখা উচিত।

যখন বিনয়ের নামে অহঙ্কার, আদেশের নামে ধর্ম্মাভিমান, সত্যের নামে ভ্রান্তি, ভ্রাতৃপ্রেমের নামে রাজনৈতিক কৌশলের অভ্যুদয় হইল, তখন আর কেহ কাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস করিতে চাহিল না। অহঙ্কারজন্য কেহ কাহাকে ভাল বাসিতেও পারিল না। বৃদ্ধের বহুদর্শন অভিজ্ঞতা শান্তির সহিত যুবার উদ্যম তেজ বীর্য্য নবানুরাগের সমন্বয়ে মহাশক্তির স্রোত বহিল না। ঈশ্বরাভিমুখ্য গতি, এক হৃদয় এক ভাবাপন্ন না হইলে দলের মধ্যে ভগবানের প্রত্যাদেশ আসে না। সুতরাং ভয়ানক বিবাদ বিচ্ছেদ দেখিয়া তিনি অন্তরালে লুকাইলেন। তখন কোলাহলের মধ্যে তাঁহার মৃদু-বাণী কেহ আর শুনিতে পাইল না। একটা নূতন সত্য কি নূতন ভাব কেহ প্রচার করিতে পারিল না। প্রত্যাদেশের যত দূর অপব্যবহার হইতে পারে তাহা হইল। ভাষ্যকারদিগের টীকা টিপ্পনির ছায়ায় মূল সূত্র সকল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। যখন প্রতি জনে জনে এইরূপে ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, তখন প্রত্যেকের ঈশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্র মত বিধি নিয়ম সাধন ভজন মন্ত্র তন্ত্র সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইল। ইহাতে বিবাদের পথ আরও খুলিয়া গেল। এক জন যদি বক্তৃতা প্রার্থনা বা সংবাদপত্রে লিখিয়া অন্যকে ভ্রান্ত মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসী সংসারাসক্ত বলিয়া আক্রমণ করেন, আক্রান্ত ব্যক্তি তদপেক্ষা দশগুণ বলের সহিত আক্রমণকারীর চতুর্দ্দশ পুরুষের পিণ্ড প্রদান করিবে। প্রতিহিংসা নির্য্যাতনে, মর্ম্মপীড়াদানে প্রত্যেকেই বিলক্ষণ পটু ছিলেন, কিন্তু পরমতসহিষ্ণুতা দয়া স্নেহ প্রেম কিম্বা সাধুতা বা হরিভক্তির প্রভাবে কেহ যে কাহাকেও পরাস্ত করিবেন সে ক্ষমতা ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না।

ঊনবিংশ শতকের এই অবস্থার গর্ভে বিংশ শতাব্দী জন্মিয়াছে; সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের অবশ্যম্ভাবী ফল কে খণ্ডন করিতে পারে? ইহার চরম ফল আরো শোচনীয় হইয়াছিল, ক্রমে তাহা বলিব। ঈদৃশ ব্যক্তিগত বিশেষ ধর্ম্মমত সাধারণ ভূমিতে আনিতে গেলে কি কখন মণ্ডলী গঠিত হয়? সাধারণ মিলনস্থলে নিজের কোন্ কোন্ মত রুচি ভাবের সঙ্কোচ আবশ্যক তাহা কেহ ভাবিল না। ভাবিয়াও কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারিল না। এরূপ অবস্থায় যদি ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেম ভক্তি দূরদর্শিতা থাকে, তাহাতে

কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু তাহারও বিলক্ষণ অভাব। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ প্রতিহিংসায় যখন প্রকৃত ভক্তিভাব এবং বিশ্বাসের হ্রাস হইল, ব্যাকুলতা পিপাসা কমিতে লাগিল, বাহ্য আড়ম্বরগুলি কেবল রহিল, তখন মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—হা দেবেন্দ্রনাথ! কেশবচন্দ্র! তোমরা কোথা? তোমাদের হৃদয়প্রসূত গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব অতি অল্প লোকেই গ্রহণ করিয়াছে! ভাবিলাম, তবে কি এই খানেই শ্রীহরি লীলা সাঙ্গ করিলেন? না, এত শীঘ্র তা কিরূপে সম্ভব হইবে? পুরাতন বিধানের পর ঠাকুর যখন আবার নূতন বিধান আনিয়াছেন, তখন পুনর্ব্বার যুগান্তরে এবং বংশান্তরে তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। এই আশায় উর্দ্ধদিকে নয়ন উন্মীলন করিয়া দুই হাত তুলিয়া বলিলাম, "রে আমিত্ব, তুমি দূর হও! ধর্ম্মের বেশে আবার তুমি ঠকাইতে আসিয়াছ? স্বয়ং ব্রহ্ম লীলাময়কে তুমি লীলা করিতে দাও! রে নীচ দুর্ব্বাসনা, ধর্ম্মনামধারী কুটিল কামনা, তোর রাজত্ব অচিরাৎ ধ্বংস হউক।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পতিতোদ্ধারিণী আশ্রম বাটীর বহির্প্রাঙ্গণে অনুকম্পা এবং নিরঞ্জনা বসিয়া ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা আলোচনা করিতেছিলেন। দুইটী ভগ্নী যেন পূর্ব্বকালের মার্থা মেরীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা। পশ্চিম গগন আরক্তিম রাগে রঞ্জিত, সূর্য্য অদৃশ্য হইয়াছে, অথচ আলোক সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ হয় নাই। বিহঙ্গমগণ কুলায় ফিরিয়া আসিতেছে, প্রদোষের শীতল ছায়ায় প্রাঙ্গণের স্নাত পুষ্পবৃক্ষগুলি নবীন প্রভায় সজীব হইয়া উঠিতেছে। অসংখ্য কলিকা খচিত যূথি গুল্মটী ক্রমে এক একটী করিয়া ফুল ফুটাইতে লাগিল। নীলাকাশব্যাপী উত্তাপবিহীন অস্তমিত রবিকিরণের কনকচ্ছটায় শুভ্রবসনা শ্বেতবরণা ভগ্নীদ্বয়ের মূর্ত্তি দুই খানি অতি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

দিবাকর বাবু দিবসের কার্য্যাবসানে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে, বিষণ্ণ ভগ্ন মনে তথায় আসিয়া বসিলেন। নিরঞ্জনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন আছেন? মুখ কেন অপ্রসন্ন বোধ হইতেছে? কার্য্যভার কিছু গুরুতর বোধ করেন কি?" অনুকম্পা বলিলেন, "দিবাকর বাবু যেন ঠিক অস্তাচল-গামী হইতেছেন। প্রথমে যে উদ্যম স্ফূর্ত্তি প্রফুল্লতা দেখিয়াছিলাম এখন সেরূপ আর দেখিতে পাই না। বোধ হয় কাজে আর বড় মন লাগিতেছে না।"

দিবাকর শুষ্ক ওষ্ঠে মলিন মুখে দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত ভদ্রতা রক্ষার উপযোগী একটু হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "ভাল এক রকম লাগিতেছে। আপনার ভগ্নী যদি মাঝে মাঝে এখানে এসে এক আধটু উপদেশ দেন, তা হইলে বেশ উৎসাহ হয়।" উত্তরটী এমন এক প্রকার ভাবে টানিয়া বুনিয়া দিলেন, স্বরে বোধ হইল, হৃদয়ে শান্তি নাই; বরং নৈরাশ্য বিরক্তির স্পষ্ট নিদর্শন তাহাতে প্রকাশ পাইল। বস্তুতঃ ঘোর নৈরাশ্যের অন্ধকারে দিবা-করের জ্যোতির্ম্ময় মুখকান্তি যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি যৌবনের মধ্য গগন পার হইয়া যেন বার্দ্ধক্যের অস্তাচলের দিকে নামিতেছিলেন।

পরে অনুকম্পা কার্য্যান্তরে ভিতর মহলে চলিয়া গেলে দিবাকর এবং নিরঞ্জনা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

গ্রীষ্মকালে ফুলের গাছগুলি সন্ধ্যার সময় জল পান করিয়া গা ধুইয়া যেমন অবিলম্বে সজীব হইয়া উঠে, দিবাকর নিরঞ্জনার গৌরবশালিনী শান্তি-ময়ী প্রসন্ন মূর্ত্তি দর্শনে, তাঁহার বিদ্যমানতার প্রভাবে এবং সহৃদয়তাপূর্ণ মধুর বচন শ্রবণে তেমনি কথঞ্চিৎ জীবিত এবং প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার নিশ্বাস নিরাশব্যঞ্জক, হৃৎপিণ্ড বিষাদভরে বিচলিত।

নিরঞ্জনা শান্ত গম্ভীর ভাবে অথচ মৃদু মধুর বচনে বলিলেন, "আমি আপনাকে এই কাজে ব্রতী হইতে বলিয়াছিলাম এই জন্য, যে ইহা দ্বারা আপনার স্ত্রী জাতির প্রতি দয়া স্নেহ শ্রদ্ধা ভক্তি বিকসিত হইবে এবং তজ্জন্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া ভগবানেতে আপনি নিত্য সুখ প্রাপ্ত হই-বেন। ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বরের পানে চাহিয়া করিতে হয়, তাঁহার প্রসন্নতা এবং "বেশ হইয়াছে" এই অনুমোদন, সেবকের পুরস্কার।"

দি। সেটাত আমি বুঝি নাই। আপনি সন্তুষ্ট হবেন, আপনার প্রসন্নতা পাব এই আশায় এত দিন খাটিলাম, আর পারিতেছি না।"

নি। কেন, আমিত আপনার কাজে বেশ সন্তুষ্ট আছি।

দি। তা কৈ বুঝিতে পারি না। এখন যেন মনে হয় ভূতের বেগার খাটিতেছি।

আসল কথাটা এই যে, দিবাকরের কোন রূপ ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল না। তিনি শিক্ষিত সরল হৃদয় ভদ্রস্বভাব সত্বগুণসম্পন্ন এই পর্য্যন্ত। সত্য বুঝিলে তাহা গ্রহণ এবং পালন করিতে পারেন। নিরঞ্জনা অগ্রে তাহা ভাল করিয়া জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন না?"

দি। বুঝিতেই পারি না, তার বিশ্বাস করিব কি প্রকারে?

নি। কি সর্ব্বনাশ! গোড়াতেই ভুল। তবে উপাসনা শুনিতে চান কেন, প্রার্থনা সঙ্গীতাদি শুনিয়া কাঁদেনই বা কেন, এত ভাবের উদ্গমই বা হয় কিরূপে! ইহা কি বুঝিতে পারেন না?

দি। তাই যদি বুঝব, তবে কাঁদব কেন? আপনার স্বর মধুর এবং কথা গুলি বড় মিষ্ট লাগে, তাই ভাবের উদয় হয়; নৈলে বিশ্বাস টিশ্বাস আমার কিছু নাই।

নি। এটাত বড় আশ্চর্য্য কথা! এরূপ হইবার কারণ কি? ধর্ম্ম-বিশ্বাস বিনা আপনি শান্তি পাবেন কি প্রকারে? প্রকাণ্ড ধর্ম্মরাজ্য কেবল সূক্ষ্ম চুলের মত বিশ্বাসে আবদ্ধ। পৃথিবীতে এত সকল ধর্ম্মসম্প্রদায, ধর্ম্মমত আছে, ইহার কোনটাতেই কি আপনার বিশ্বাস হয় না?

দিবাকর এ কথা শুনিয়া তখন আন্তরিক বিশ্বাসের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমি পৃথিবীর ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের মত এবং কার্য্যের পরস্পর অনৈক্য দেখিয়া বুদ্ধের ন্যায় নিরীশ্বরবাদী, এবং আধুনিক এগ্‌নষ্টিকদিগের ন্যায় অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছি। তাহারা শাস্ত্রের উচ্চতর আদর্শ মতগুলি লইয়া অন্যের সঙ্গে বিবাদ বাধায়, কিন্তু কার্য্যকালে আপনারা সে উচ্চ মতকে কাটিয়া ছাঁটিয়া তাহাতে বিশেষণ দিয়া স্বার্থ সাধনের উপযোগী করিয়া লয়। অথচ অন্যে সেরূপ করিলে তাহাকে বাঘের মত আক্রমণ করে। এই সব দেখে শুনে মনে হয়, ধর্ম্মের নামে কপটতাই অধিক।"

নি। সকলেই কি এইরূপ কপট? আদর্শানুসারে চলিবার জন্য যথা-সাধ্য অন্তরঙ্গ চেষ্টা করে এমন কি কেহ নাই?

দি। কৈ, দেখিতেত পাই না। অবশ্য আপনার কথা স্বতন্ত্র। আমার বোধ হয় ধর্ম্ম একটা লোকের ব্যবসায়। এক দিকে ধ্যান যোগ বৈরাগ্য ভক্তির মাতামাতি, অপর দিকে মিথ্যা প্রতারণা অভিমান হিংসা লোভ স্বার্থপরতা প্রভৃতি সচরাচর দৃষ্ট হয়।

নিরঞ্জনা দিবাকরের এই সরল বিশ্বাসের সহজ কথা গুলি শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন। কথাগুলি মনে লাগিল। পরে বলিলেন, "মানুষ মাত্রেই দুর্ব্বল। খুব ধর্ম্ম আছে বলিয়াই যে সে একবারে নির্দ্দোষ হইবে এটা আশা করা যায় না। তবে ইহা নিশ্চয় জানিবেন, যাহারা একান্ত মনে ভাল হইবার জন্য চেষ্টা করে, আর যাহারা আপনাদিগকে দুর্ব্বল অপূর্ণ জানিয়া আগে থাকতে পাপের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক অদৃষ্টের দোহাই দেয়, ইহাদের উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। কিন্তু ধর্ম্মের নামে যে অনেক কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহা আমি মানি। যাহারা অন্যকে ধার্ম্মিক করিবার জন্য উপদেশ দেয়, তারা নিজেই অধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার সহায়। যাহা হউক, ভ্রান্ত সংস্কার বশতঃ আপনার চিত্ত এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে আমি এখন বুঝলাম।

দি। আসল কথাটা কি তা জানেন, মানুষ এক অভ্যাসের দাস হইয়া জড়ের মত কার্য্য করে, বসিয়া থাকিতে ভাল লাগে না বলিয়া করে; আর এক এই আশায় করে যে, অমুক লোক কিম্বা দলবিশেষ ইহাতে সন্তুষ্ট হবে, আমার স্বার্থ সিদ্ধ হবে, মান বাড়িবে, আমি যাহা চাই তাহা পাব। কিন্তু আমি দুয়ের বাহির হইয়াছি। অভ্যাসও নাই, অনুরাগও নাই; আশা প্রত্যাশা বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে।

নি। মানুষ যাহা দিতে পারে না, পারিলেও যাহা চিরকাল ভোগ করা যায় না, তার উপর নির্ভর না করিয়া, যিনি স্বয়ং অনন্ত কালের ভোগ্য, তাঁর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করুন, তাহাতে স্বয়ং ভগবানও সন্তুষ্ট হবেন, আমিও হব।

দি। ভগবানের সন্তোষ অসন্তোষ বুঝিতে পারি না, আপনাকে সন্তুষ্ট করাই আমার ধর্ম্ম, আপনি প্রসন্ন হইলে আমি সব করিতে পারি।

নিরঞ্জনা সমদুঃখদয়তার সহিত দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিলেন, "এই খানেই আপনার ভুল। ব্রাহ্মসমাজে অবশ্য আপনি এটাও ত দেখেছেন, অন্ততঃ শুনেও থাকিবেন, কত কত ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মবন্ধুরা সুখদুঃখনিরপেক্ষ হইয়া

ঈশ্বরসেবায় কেমন পরিশ্রম করেন! ঈশ্বর গোপনে তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেন।

এ কথায় দিবাকরের মুখাগ্রভাগে সহসা সবলে প্রতিবাদের শব্দ আসিয়া আঘাত করিল। কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা পরীক্ষিত জ্ঞানও তাহার মূলে বর্ত্তমান ছিল। পরে তিনি বেগ কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া বলিলেন, "আমি এ কথাটী স্বীকার করিতে পারিতেছি না। আমি যত দূর দেখিয়াছি, ব্রাহ্মেরা মানুষের দিকে চাহিয়াই কার্য্য করেন। ভগবান কেবল সাক্ষীগোপাল মাত্র। অনেক খ্রীষ্টীয়ান যুবক যুবতী যেমন বিবাহের আশায় গির্জ্জায় যায়, অনেক ব্রাহ্ম যুবক যুবতী এখন সেই আশায় সমাজে গিয়া থাকেন। উপদেষ্টা যিনি তিনি কর্ত্তৃপক্ষের সন্তুষ্ট সাধনের জন্যই ব্যাকুল। শ্রোতাগণ অধিকাংশই নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য কাহাকেও নিন্দা, কাহাকেও প্রশংসা করেন। এই জন্যই বাহিরে বেশ শান্তি ভদ্রতা ধর্ম্মোৎসাহ প্রকাশ পায়। ইহা অবশ্য আধুনিক সভ্যতার নীতিশাস্ত্রানুমোদিত বটে। আমি এই নীতির পক্ষপাতী। ইহাতে সুখ সুবিধা যথেষ্ট আছে।"

নি। এ রূপ নীচ ষড়যন্ত্রের স্বার্থমূলক নীতি যদি ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম হয়, তবে আজ কাল দলের ভিতর এত সংগ্রাম চলিতেছে কেন? উচ্চতর যোগ বৈরাগ্য প্রেম ভক্তির অভাবই বা কেন সকলে অনুভব করিতেছেন? আপনি কি সকলকেই এক দলে ফেলিতে চাহেন?

দিবাকর একটু কুণ্ঠিত হইয়া জিহ্বা কাটিয়া নরম সুরে, বলিলেন, "না, না, তা কেন, তা কেন! আমাকে ক্ষমা করুন। সরল হৃদয় ভক্ত বিশ্বাসী ভাল লোকও অনেকে থাকতে পারেন। তবে কথাটা এই যে, সম্পূর্ণ খাঁটি ধর্ম্ম আমি কোথাও দেখিতে পাই না। কিছু না কিছু ভেঁজাল সর্ব্বত্রই দেখা যায়। অবশ্য প্রত্যেক উচ্চ বিষয়েরই অপব্যবহার হয়। কোন সত্য বা মত জ্ঞান বিশ্বাস সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণও নয়; সমস্তই আংশিক আপেক্ষিক।

নি। সে কথা যাক। আচ্ছা, আপনি কেন গৃহধর্ম্মে প্রবেশ করুন না? তাতে আপনার মন ভাল হবে।

দি। আমার বাঁচিতে আর বড় ইচ্ছা নাই। জীবন ধারণে কিছু মাত্র সুখ দেখি না। পৃথিবীটে বড় দুঃখের স্থান।

নি। আপনি কি ইহা অপেক্ষা ভাল পৃথিবী সৃষ্টি করিতে পারিতেন?

দি। তা না পারি, কিন্তু লোকের বড় দুঃখ।

নি। আমিত দেখছি পৃথিবী বড় সুখের স্থান। আপনার মন বিরক্ত চঞ্চল, তাই কেবল দুঃখই দেখিতে পান। এ অবস্থায় আপনার একা থাকা উচিত নয়।

নিরঞ্জনার মনে দয়া হইল, কিন্তু দিবাকরকে তিনি অতি কৃপাপাত্র মনে করিলেন। কি করিবেন, বিশ্বাস ভক্তিকে যে কবিত্ব কল্পনা মনে করিয়া বসিয়া আছে, নীতির সুশাসন যার পক্ষে স্বার্থের উপায়, তাহাকে কে সান্ত্বনা দিতে পারে? তিনি আশ্রমের অধিবাসিনীদিগকে লইয়া উপাসনা করিবার জন্য ভিতর বাটীতে চলিলেন, দিবাকর অবশভাবে জড়ের মত ভগ্নমনে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল এবং নির্বোধের ন্যায় বলিতে লাগিল, "আমি কি এক পার্শ্বে একটু স্থান পাইতে পারি? আপনার উপাসনাদি শ্রবণের জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে। জীবনের গতিটে আমার ফিরাইয়া দিতে পারেন?"

নি। সে কি আর মানুষের কাজ? দেবতার কৃপাশক্তি এবং নিজের পুরুষকার চাই।

দি। আমারত স্বাধীনতা নাই, আমি অবস্থা এবং ঘটনার দাস। যাহা ভাল লাগে না, তাহা কি চাহিতে ইচ্ছা হয়? না চাহিলেই পাওয়া যায়? জীবনের স্রোত যে দিকে আপনি ছুটিতেছে, সেই দিকে যাইতেই ইচ্ছা করে। আমার চেষ্টা প্রার্থনা প্রতিজ্ঞা যেন ভাদ্রের পদ্মার স্রোতমুখে ধূলিকণা নিক্ষেপ।

নি। স্রোতের মুখে বাঁধ বাঁধিতে হইলে ঐ রূপ ধূলি নিক্ষেপই চাই। ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে শক্ত জাঙ্গাল হইয়া উঠিবে।

পতিতোদ্ধারিণী আশ্রমে অন্দর মহলে কোন পুরুষের যাইবার অনুমতি ছিল না। অনন্তর নিরঞ্জনা ব্যথিত অন্তরে মৃদু স্বরে বলিলেন, "আপনি উদ্দেশ্য ঠিক করিয়া সেবায় নিযুক্ত থাকুন, আর একান্ত চিত্তে কাতর ভাবে দয়াময় প্রভুর নিকট বার বার প্রার্থনা করুন, তাহাতে সব দুঃখ চলিয়া যাইবে। উপাসনায় যোগ এখন দিতে পারিবেন না।" এই বলিয়া তিনি দ্রুত পদে ভিতরে চলিয়া গেলেন, দিবাকর কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবনী শক্তি যেন নিরঞ্জনার সঙ্গে সঙ্গে

চলিয়া গেল, হৃদয় খালি হইল, শরীর দুর্ব্বল এবং শিথিল হইয়া পড়িল, প্রাণ হু হু করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "হায় আমি কিরূপে এই কঠোর কর্ত্তব্যভার বহন করিব! কাজ করিয়াই বা আমার কি ফল হইবে? এখন খালি হৃদয় আমার কে পূর্ণ করিয়া দিবে।" হা দুঃখী জীব! কে আছে, কে আর পূর্ণ করিবে? যিনি চিরপূর্ণ তিনি ভিন্ন শূন্য হৃদয় কেইবা পূর্ণ করিতে পারে?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মসমাজ গৃহের বেদীতে বসিয়া মুদ্রিত নয়নে উপাচার্য্য উপাসনা করিতেছেন। উজ্জ্বল গ্যাসালোকে শ্রোতৃবর্গ শুভ্র সুন্দর বেশে উপবিষ্ট আছেন। অনেকেরই চক্ষু উন্মীলিত। কেহ কেহ ফিস্ ফিস্ শব্দে কাণে কাণে কথা কহিতেছেন, কেহ বা হাসি ঠাট্টা আমোদ করিতেছেন। শ্রান্ত দর্শক টানাপাখার বাতাস খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। শ্রোতাদিগের মনোযোগের অভাব দেখিয়া উপাচার্য্য মনে মনে চটিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আরাধনার মন্ত্রের মধ্যে দুই পাঁচটা কঠোর ভৎ'সনা চালাইয়া দিতেছেন। কিন্তু কার উপরেই বা তিনি চটিবেন। দ্বিতীয় সঙ্গীতের পর কতকগুলি লোক উঠিয়া চলিয়া গেল।

উপাচার্য্য আরাধনা আরম্ভ করিলেন। তিনি কেবল ভাল ভাল কথা, জ্ঞানসঙ্গত, যুক্তিযুক্ত কবিত্বরসপূর্ণ শব্দ খুঁজিতেছেন। কখন আলঙ্কারিক ভাষার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিতেছেন। কাজেই অন্তঃকরণটা কতক শ্রোতার দিকে, কতক ভাষার দিকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একটী মাত্র ক্ষুদ্র হৃদয়, কত দিকে আর তাহা যাইতে পারে? ভাব গতি দেখিয়া ভগবান সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। একে তিনি সূক্ষ্ম নিরাকার, তাতে আবার পুরোহিত মহাশয়ের চিত্তের গতি বাহিরের দিকে, সুতরাং উপাস্য দেবতা যিনি তিনি কাছে থাকিয়াও নাই। তুমি যদি তাঁর পানে দৃষ্টি না ফেরাও তিনি দেখা দিবেন কেন? সুশিক্ষিত রসনা পুরাতন অভ্যাসের গুণে প্রমুক্ত ভাবে এমনি বেগে দৌড়িতেছে যে,

হৃদয় তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে পারিতেছে না। বাক্যের ঝড় তুফানের ধাক্কা লাগিয়া সে বেচারা বহু দূর পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, রসনা তাহার প্রতি আর ফিরিয়াও চাহিল না।

যেমন গুরু তেমনি শিষ্য। শ্রোতাদিগের মধ্যে যে একটু পিপাসু, সে গোপনে আপন মনে আপনার অন্তর্য্যামীকে অন্তরের নীরব ভাষায় পূজা করিতেছে, কদাচিৎ সঙ্গীত কিম্বা পাঠ ব্যাখ্যায় এক আধটু যোগ দিতেছে। সে প্রকার যাহাদের অভ্যাস নাই, অথচ সবল চিত্ত, ভাল উপাসনা শুনিলে যাদের ভাবের উদ্গম হয়, তারা বিরক্ত হইয়া মনে মনে উপাচার্য্যের কথার দোষ ধরিয়া সমালোচনা করিতেছে।

গদাধর বাবু প্রত্যেক কথার দোষ ধরিয়া রাগিতেছেন, আর বলিতেছেন, "থামলে বাঁচি বাবা। কার মুণ্ড কার ঘাড়ে চাপাচ্ছে তার ঠিক পাওয়া যায় না। সব শোনা কথা; জীবনের কথা, সাধনের কথা একটাও নয়। নিজেই যদি তুমি নিজের কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, তবে অন্যে পারিবে কেন? মুখের কথায় কি শক্তি সঞ্চার হয়?

সরলচন্দ্র বাবু পূর্ব্ব হইতেই বিরক্ত ছিলেন, উপাচার্য্যের অসার বাক্যাড়ম্বরের মধ্যে কেবল দ্বিরুক্তি, অর্থহীন অনুপ্রাস, ভাববিহীন কবিত্ব, জ্ঞানহীন যুক্তি, রসহীন রূপক, জীবনহীন দৃষ্টান্ত, এই সকলের তিনি দোষ বাহির করিতে লাগিলেন।

পরে উপদেশও আরম্ভ হইল, লোকও ক্রমে উঠিতে লাগিল। কিন্তু উপাচার্য্য নিজের ভাবেই মত্ত; দুই চক্ষু বুঁজিয়া তিনি এমনি বকিতেছেন, যে কার সাধ্য তাঁর সঙ্গে চলে। অনেক লোক উঠিয়া গেল, পরিচিত নিয়মিত উপাসকও অনেকে গেল, অল্প জন কয়েক রহিল। যাহারা রহিল, উপাসনান্তে উপদেষ্টাকে উপদেশ দিবার জন্য রহিল।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঘড়ি দেখাইয়া কাণে কাণে বলিলেন, "মহাশয়। সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, শীঘ্র শেষ করিয়া লউন; শ্রোতা সব চলিয়া যাইতেছে। কমিটীর নূতন নির্দ্ধারণ মতে এক ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইলে পদচ্যুত হইতে হইবে।" উপাচার্য্য মহাশয়ের মনে সে দিন একটী অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল; লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া দৃষ্টান্ত রূপক ইত্যাদি দ্বারা উপদেশকে তিনি বড় দীর্ঘ করিয়া ফেলিলেন। শেষ প্রার্থনার সময় করুণ রস আনিবার জন্য অতি কাতর

স্বর বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি জানিতেন, প্রাণ কাঁদুক না কাঁদুক, ক্রন্দনের স্বরটী চাই। ঠাকুর যেন দিবা নিশি কাঁদিতেছেন আর কাঁদাইতেছেন।

উপাসনা শেষ হইল। ভাবাতিশয্য বশতঃ উপদেষ্টা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চক্ষু বুঁজিয়াই রহিলেন। আলোক নিবিয়া গেল, তবু তিনি উঠিতে চাহেন না। পরে দ্বার দেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গদাধব, সবলচন্দ্র, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি তথায় অপেক্ষা কবিতেছেন।

উ। আজ খুব লোক হয়েছিল না হে?

কার্য্যাধ্যক্ষ। খুব আর কৈ, শেষে বড় কেউ ছিল না। আপনি যে লম্বা করলেন। এ জন্য কমিটিব কাছে আমাকেই শেষ ভুগতে হবে।

উ। আজ ভাই আমি কিছু স্থির কবে আসি নাই। এমনি ভাব এসে পড়তে লাগল, যে আটকাতে পাবলুম না। তবু আমি অর্দ্ধেকও বলি নাই। ভাবটী বড়ই নূতন। আশু বাবু শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন কি?

কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, "আশু বাবু সিকি উপদেশ না হইতে চলে গেছেন।"

উ। বটে! লোকটার কিছু হবে না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বড়ই কম। এ জিনিষ আব কি আসবে? সকল বিষযেবই সুসময় আছে। আচ্ছা, আমি তাকে বাড়ী গিয়া অবশিষ্ট শুনাইয়া আসিব। সরল বাবু, আজ শুনলেন কেমন? ভাবটী বেশ নূতন বোধ হইল না? আমি ভাই নিজের ভাবে নিজেই মোহিত হয়ে পড়েছিলুম। আহা! আমরা ঈশ্বরের "পুষ্যি পুত্র" তাই তিনি এত আদর কবেন।

গ। ক্যাপিটেল আইড়িয়া! আচ্ছা তা হলে আমাদের সহোদর বাবা কে?

উপাচার্য্য গম্ভীব ভাবে মুখ ফিবাইলেন।

স। পুষ্যিপুত্তর গুল কিন্তু বড় বযাটে হয়ে যায়।

উ। আহা ও ভাবে কেন নিচ্ছ। পিতার আদর যত্ন তার প্রতি কত তাই দেখ না। অক্ষবে অক্ষরে রূপক নিলে কি চলে? তোমরা নিতান্ত স্থূলদর্শী অরসিক। বড় দুঃখের বিষয় যে এত চেষ্টা কবলাম, তবু ভাবুকতা আর আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে কারো দৃষ্টি গেল না।

উপাচার্য্য মহাশয়ের স্পিরিট বড় বাধা পাইল, রসভঙ্গ হইতে

লাগিল। উপাসনার আনন্দ অর্থাৎ আত্মগরিমার সুখ টুকু নির্ব্বিঘ্নে আর তিনি বাড়ী পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি ভাবেগদ্গদ হইয়া যত উন্নতির কথা বলেন, গদাধর সবলচন্দ্র ততই চুপ করিয়া থাকে এবং মুখ বাঁকায়, আর আস্তে আস্তে নরম কথায় তাহার প্রতিবাদ করে।

উপাচার্য্য। হিরণ্য বাবু, আনন্দ স্বরূপের ব্যাখ্যাটী কেমন শুনলে ? বেশ গভীর এবং মিষ্ট নয় ? আজ অনেক নূতন ভাব, নূতন কথা তার ভিতর ছিল।

হি। আনন্দ স্বরূপ কোন্‌টা বলুন দেখি। সবই ত এক মনে হয়।

উ। কেন পুণ্য স্বরূপের পর। তবে তোমার মন কোথায় ছিল ? যোগ দাওনি না কি ? তোমরা মিছে আসই বা কেন ! এটা কি একটা ইয়ারকির আড্ডা ?

গদাধর স্পষ্ট কথায় বলিলেন, "যোগ বোধ হয় কেহই দেয় না। আমি ত দিই না বলিতে পারি। ভগবানকে লইয়া আমার দরকার; যত ক্ষণ আপনার কথার জঙ্গলে পড়িয়া খাঁটি ভাব খুঁজিব, মানে বুঝিব, তত ক্ষণ তাঁর মুখের পানে নীরবে চেয়ে থাকলে কাজ দেখবে।"

উপাচার্য্য মহাশয় ক্রমেই চটিতেছেন। সবল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি যোগ দিয়াছেন কি না। তিনিও বলিলেন, "আমি নিজে নিজে উপাসনা করি। অন্যের সঙ্গে আমার যোগ দেওয়া প্রায় ঘটে না, তাতে বিঘ্ন জন্মে। উপাসনা নিগূঢ় বিষয়, এখানে কুটুম্বিতা লৌকিকতা চলে না।" পরে মনে মনে বলিলেন, "যার যা ইচ্ছা বকবে, আমি এখন তাতে যোগ দি ! যোগ এত কিছু সস্তা নয়। ভগবান্‌কে দেখিয়ে দাও, তখন যোগ দিব।"

কার্য্যাধ্যক্ষ মধুকর বাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "আমাকে আবার শান্তি রক্ষার জন্য এদিক্ ওদিক্ মাঝে মাঝে দেখতে হয় কি না ? তা যোগ দেওয়া যায় বৈ কি। সব সময় কি আর মন ঠিক থাকে ?"

উ। তবে আর ভাল লাগবে কেন ? তোমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বরের পূজা করিবে, অথচ মুখে বলিবে আমরা এক ঈশ্বরের উপাসক, এক সম্প্রদায়ভুক্ত। এ সব যে মিথ্যা কথা। তোমরা বহুদেবতার পূজক, পৌত্তলিক। সামাজিক উপাসনা তোমাদের আদবেই হয় না। এক জায়গায় শরীর কয়টা রাখলে কি হবে ?

গ। আচ্ছা মশায়, ঠিক বলুন দেখি, আমার যেন সন্দেহ হচ্ছে, আপনি হয়তো স্বরূপ চুরি করেছেন।

উ। তুমি যোগই দাও না, তবে চুরি বুঝলে কি করে ?

গ। হাঁ আপনি নিশ্চয় চুরি করেছেন। নৈলে বক্তৃতা লম্বা করিবার জন্য এত সময় পেলেন কিরূপে ?

স। আজিকার উপদেশের যে বিষয়, সেটা কি আপনি প্রত্যাদেশ বলেন ?

উ। তা নয়ত কি ?

স। যত কিছু কাজ আপনি করেন, এবং যেখানে যা কিছু বলেন, সমস্তই কি ঈশ্বরাদেশে সম্পন্ন হয় ?

উ। অবশ্য। অবিশ্বাসী, বৌদ্ধদিগের ন্যায় কি আমি বুদ্ধির উপাসক ?

স। আপনি বোধ হয় তবে মহাপাপী, অতি পাষণ্ড মিথ্যাবাদী।

উ। নির্ব্বাক হতবুদ্ধি। (মুখ খানি মলিন করিয়া) আমি মিথ্যাবাদী !

এইরূপ শ্লেষ নিন্দা অপমানের নির্ঘাত প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া উপাচার্য্যের চক্ষু আরক্ত হইল, ঠোঁট হাত পা কাঁপিতে লাগিল,অভিমানে ক্রোধে তিনি শেষ আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া বলিলেন, "কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা ! ভদ্রলোকের সম্মুখে আমাকে অপমান ! আমি মিথ্যাবাদী মহাপাপী ! পাপের লেশমাত্র আমাতে নাই তা জান ? আমি কি তোমাদের মত অল্পবিশ্বাসী ভক্তিবিরোধী তাই পাপ হবে ? ঘৃণা করি তোমার কথায় ! পদাঘাত করি !" এই বলিয়া জুতাশুদ্ধ মাটীতে সজোরে পদাঘাত করিলেন। নাথ মুখ চোখ হাত মাথা ঘুরাইয়া ভয়ানক আস্ফালন করিতে লাগিলেন। গালাগালির শব্দগুলি আধ খান আধ খান অস্পষ্টরূপে শুনা গেল। কিন্তু নিজপদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য তাহা এক প্রকার বিকৃত হাসির দ্বারা শেষ চাপা দিলেন।

স। আচ্ছা, পাপের যদি লেশ মাত্র আপনাতে নাই, তবে প্রার্থনায় অত অনুতাপ ক্রন্দন কেন ?

উ। সে কি আমার নিজের জন্য সামান্য ক্রন্দন। ভাবের উচ্ছ্বাসে পরের দুঃখে দুঃখী হয়ে কাঁদি। তুমি মূর্খ তার মর্ম্ম কি বুঝবে ?

স। আপনি পণ্ডিত, এ বিষয় ভাল বোঝেন। আচ্ছা, তবে "আমি জঘন্য দুরাচারী অহঙ্কারী কপট স্বার্থপর কলঙ্কী পাষণ্ড" ইত্যাদি কথা বলিলেন কেন ? নিশ্চয় তা হইলে আপনি হয় ভয়ানক দুষ্কর্ম্মান্বিত, না হয় ভয়ানক কপট মিথ্যাবাদী।

উ। আরে হতভাগ্য, সে যে তোদের জন্যে ! তার সঙ্গে আমার জীবনের

সম্বন্ধ কি? আর যদি ঈশ্বরের কাছে নিজের পাপ দোষ আমি স্বীকারই করি তুই কেন তা বলবি? তোদের কাছে কি আমি কখন নীচতা স্বীকার করিছি?

গ। হাঁ, তাও করেছেন। "ভাই ভগ্নীর পদরেণু করে রাখ।" এ কথাও কত বার প্রার্থনায় বলেন।

উ। হাঃ হাঃ হাঃ অরে নির্ব্বোধ! সে কি তোদের সম্বন্ধে? স্বর্গের দেবদেবীদের সম্বন্ধে!

হি। তবে ভগবানকে কি মিথ্যা কথা কতকগুল বলিয়া কপট ভাবে ক্রন্দন করিবার জন্যই প্রার্থনার সৃষ্টি হয়েছে? মুখে বলছেন, "মহাপাপ স্মরণ করিয়া আমার প্রাণ কম্পিত হইতেছে" অথচ আমি স্বচক্ষে দেখলাম, ঠিক কাষ্ঠ পাষাণের মত অসাড়।

উ। পাষণ্ড! প্রার্থনা এইরূপেইত করিতে হয়। তাঁকে আমি মনের দুঃখ জানাব। তোরা আমার পায়ের তলে থাকবি।

স। হে সাধু, তাত বুঝলাম। এখন তোমার কোন্ কথাটী তবে সত্য?

হি। আচ্ছা ঠিক বলুন দেখি, আপনি আদেশ পাইয়া রাগিতেছেন এবং গালাগালি দিতেছেন কি না?

উ। কখন আমি রাগিনি! আমি কি পশু তাই রাগব?

স। যদি রাগেন নি, তবে অত কঠোর বাক্যে চীৎকার করা হচ্ছে কেন?

উ। তুমি ছেলে মানুষ, তার মানে কি বুঝবে? খুব ইম্প্রেসিভ্ হবে বলে চড়া স্বরে বলছি।

স। মুখ তবে বিকৃত কেন? চোখ ঘোরাল কেন? কটু কথা কেন?

উপাচার্য্য মহাশয় শেষ অভিমানে অধীর হইলেন, প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অক্ষম হইয়া আমতা আমতা করিতে লাগিলেন, ক্রোধকে ধর্ম্মক্রোধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু নিজেরই হাত পা নাক মুখ চোখ তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল। শেষ দুঃখিত হয়ে বলিলেন, 'কি আশ্চর্য্য, ঈশ্বরাদেশে লইয়া উপহাস! তোদের মত দুরাত্মা আর জগতে নাই।"

সবলচন্দ্র মৃদু মৃদু হাসিয়া নম্র ভাষায় বলিলেন, "আপনার মত ধার্ম্মিকও আর দেখা যায় না।"

উ। রে হতভাগ্য নরাধম সকল, আদেশবাণীর প্রতিও কি তোদের ভয় হয় না? তোরা তবে নাস্তিক।

স। হে আস্তিক, এ যদি তোমার আদেশ, তবে নিদেশ কি?

উ। নিদেশ তোর বাবা! ব্যাটা বদমায়েস, আমাকে যেন ক্ষেপা পাগল পেয়েছে!

পরে একটু অপ্রতিভ হইয়া নরম স্বরে বলিলেন, "তোমরা অতি নির্ব্বোধ, তাই এরূপ অসম্ভ্রমের কথা বল। প্রতি দিন উপাসনা করিয়া থাক কি?

মধুকর। কেউ কেউ বলে যে আপনিও না কি বাড়ীতে উপাসনা করেন না, কেবল রবিবারে বেদীতে বসে লম্বা লম্বা উপদেশ ঝাড়েন।

উ। সে আর কে বলবে? এই সব মহাত্মারা! ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই তারই এই পুরস্কার। আপনার কত ক্ষতি স্বীকার করে, স্বাস্থ্য বিশ্রাম বিষয়কার্য্য স্ত্রী পুত্র মান সম্ভ্রমের দিকে না চেয়ে মরিতে মরিতে এখানে আসি, ঠিক তার উপযুক্ত ফল বটে; অর্থের কোন সম্বন্ধ থাকিলে না জানি কি দুর্দ্দশাই ঘটিত!

হিরণ্যাক্ষ অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন, "অর্থ না থাক, স্বার্থ আছে। সম্ভ্রম মর্য্যাদার মূল্য বড় কম নয়।"

গদাধর। আচ্ছা মশাই, তবে কি ও অপবাদটা মিথ্যা?

উ। নিশ্চয় মিথ্যা। আমি বাড়ীতে রোজ দুই ঘণ্টা ধরিয়া উপাসনা করি।

হিরণ্যাক্ষ গদাধরের কাণে কাণে বলিলেন, "ওঁর উপাসনা মানে আফিনের ঝোঁকে চক্ষু বুজে বিছানায় পড়ে থাকা।"

মধুকর সকলকে বলিলেন, "দেখুন মশাই, আপনাদের কথা খণ্ডন হয়ে গেল। ভদ্রলোক যখন স্পষ্ট নিজমুখে স্বীকার করিতেছেন, আমি উপাসনা করি, তখন ইহার উপর কথা কহিলে সভ্যতা এবং ভদ্রতার অবমাননা করা হয়।"

স। তা হয় হউক, কিন্তু সত্য জিনিষটা তাহারও উপরে।

উ। তবে কি তুমি আমায় মিথ্যাবাদী মনে করিতেছ? খবরদার! তোমাকে বারণ করিতেছি, এমন কথা আর মুখে আনিও না। এ সব তোমাদের ভুল এবং বিদ্বেষের কথা। আমি শপথ—না, শপথ

করা উচিত নয়—গম্ভীর ভাবে বলিতেছি, এ স্পষ্ট উত্তরের বিরুদ্ধে কোন ভদ্রলোক কথা কহিতে পারে না।

সবল বাবু নীরব রহিলেন, কিন্তু দমিলেন না। মনে মনে গুজ্ গুজ্ করিতে লাগিলেন।

উ। চুপ করে রইলে যে? আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম, তাতেও তোমার প্রতীতি হল না?

স। আমিও গম্ভীরভাবে উহা অবিশ্বাস করিতেছি। মিথ্যাকে সত্য-রূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য এরূপ ভদ্রতার গাম্ভীর্য্য একটী বিশেষ কৌশল। আপনার মুখ চোখ অন্য রূপ বলিতেছে।

উ। উঃ কি অকৃতজ্ঞ অভদ্র তোমরা। নিঃস্বার্থ ভাবে ঘরের খেয়ে এত উপকার করলাম, কত সদুপদেশ, সুশিক্ষা দিলাম, শেষ কি না তাহার বিনিময়ে এই জঘন্য কৃতঘ্নতা, নিমোখারামি! ইহার প্রতিফল তখন বুঝিতে পারিবে, যখন ভবিষ্যদ্বংশের নিকট উপকারের বিনিময়ে তোমরা আবার এইরূপ কৃতঘ্নতা পাবে।

গদাধর। মহাশয়েরও ত এ পুরস্কার পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা অকৃতজ্ঞতার ফল। বংশের পর বংশ এইরূপই চলিয়া আসিতেছে।

উপাচার্য্য মহাশয় এক মধুকর ব্যতীত কাহারো নিকট আর সহানুভূতি পাইলেন না। ভাবিলেন, এ ব্যাটারা সবই বেল্লিক বেহায়া। যেন ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে অপমান করিতে বসিয়াছে। অতঃপর হাত পা কোন রকমে বশে রাখিলেন, কিন্তু রসনা বেগ মানিল না, উন্মাদের ন্যায় অনেক মন্দ কথা বলিয়া ফেলিল।

তখন গদাধর দুই হাতের গুলি ফুলাইয়া বুকে চাড়া দিয়া চক্ষু রাঙ্গাইয়া আস্তিন গুটাইয়া উপাচার্য্যের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং সিংহগর্জ্জনে বলিল, "রে দুষ্ট, এমনি করে তুই ধর্ম্ম রক্ষা করবি। জিহ্বার শাসন নাই, তুই আবার ইন্দ্রিয়দমন যোগ সাধনের উপদেশ দিতে আসিস্। বেদী হইতে তোকে ঠ্যাং ধরিয়া নীচে নামাব, বক্তৃতা বন্ধ করব। কপট ধর্ম্মধ্বজী, এক ঘুঁশিতে তোর মগজ বার করে দেব।"

গদাধরের তেজস্বিনী ভাষার হৃদয়গ্রাহী মর্ম্মান্তিক উপদেশ বচনের ফল হাতে হাতে ফলিল। উপাচার্য্য স্থির হইলেন, গোলমাল থামিয়া গেল। বড় বাগের কাছে ছোট বাগ হার মানিল। শেষ সকলেই দুঃখিত

হইয়া সমাজের দুরবস্থা আলোচনা করিতে করিতে এবং চুরট খাইতে খাইতে ঘরে চলিয়া গেলেন। উপাচার্য্য মহাশয়ও চুরটের ধূমপানে অন্তরাত্মাকে শীতল করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মসমাজে দলাদলি অপ্রেম, ভ্রাতৃবিচ্ছেদজন্য যে সকল অনিষ্টের সূত্রপাত হয়, তাহার পূর্ব্বাভাস ঊনবিংশ শতের শেষ ভাগে কতক দেখা গিয়াছিল। সে স্রোত এক স্থানে বদ্ধ থাকিবার নয়। বর্ষের পর বর্ষ বিশ্বাস ভক্তি ধর্ম্মতৃষ্ণা যেমন কমিতে লাগিল, এবং জন্মগত এবং বিবাহগত সভ্যসংখ্যা যত বাড়িতে লাগিল, ততই ধর্ম্ম জীবনহীন বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হইয়া উঠিল। শেষ রহিল কেবল পুঁথিগত বিদ্যা, প্রাণ-হীন বিধি ব্যবস্থার অনুসরণ। ঊনবিংশ শতের শেষ হইতে আর আমি এখন যে সময়ের কথা লিখিতেছি ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অন্যূন শত বৎসরের ইতিহাসের ঘটনাবলীর মধ্যে বিধাতার বিধাতৃ শক্তি যে নিদ্রিত ছিল তাহা নহে, সাধারণ ভাবে কার্য্যকারণের অবশ্যম্ভাবী নিয়মে ব্যক্তিগত নিগূঢ় ধর্ম্মের প্রসাদে সামাজিক এবং নৈতিক উন্নতির স্রোত একবারে অবরুদ্ধ হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের এই কতিপয় বৎসরের বিবাহের তালিকা বেশ আশাজনক। কলেজ স্কুল বোর্ডিং আশ্রম উপাসনালয় লাইব্রেরী সভা স্ত্রীবিদ্যালয়, বড় বড় সৎকীর্ত্তি অনেক হইয়াছে। দেশের সাধারণ জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি বিষয়ে তদ্দ্বারা অনেক উপকারও হইয়াছে। এই সমস্ত সৎশিক্ষা এবং সদনুষ্ঠানের ফল যে কেবল ব্রাহ্ম-সমাজে বদ্ধ ছিল তাহা নহে, দেশের অন্যান্য শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সমাজেও তাহার প্রভাব প্রচ্ছন্ন ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ বিধাতার একটী বিশেষ মঙ্গল বিধান, সুতরাং তাহার কার্য্য বন্ধ থাকিতে পারে না। মনুষ্য সকল অযোগ্য হইলেও তিনি নিজগুণে অনেক কার্য্য করাইয়া লইলেন। কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ে গত শতাব্দীতে যে বিশেষ ভাবের আবির্ভাব হয় তাহার স্রোত একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এ সময়ে ব্রাহ্মসমাজে সাধারণতঃ সামাজিক ভাবে

বাহিরে যে ধর্ম্মভাব দেখা যাইত তাহা যেন নাট্যাভিনয় বলিয়া মনে হইত। আধুনিক ব্রাহ্মচরিত্রে সাধু ভক্ত যোগী বৈরাগীর উচ্চ জীবন এবং তপপ্রভাব প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। যে ধর্ম্ম নীতি জাতিসাধারণের শোণিতের সহিত মিশিয়া পুরুষানুক্রমে মানবচরিত্র গঠন করিবে, জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্ম্মের সামঞ্জস্য শিক্ষা দিবে, সে ধর্ম্ম কৈ? মানুষ বাঁচিবে কি ধরিয়া? বুদ্ধিগত একেশ্বরবাদ আর সমাজসংস্কার বাহ্য সভ্যতা দ্বারা কি কখন ধর্ম্মতৃষ্ণা নিবারণ হইতে পারে?

আহা! কি স্বর্গীয় ধর্ম্ম দেখিয়াছিলাম, আর শেষে কি দেখিতে হইল। ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় এবং চতুর্থ যুগের সাতন্ত্র্যপ্রিয় সাধু ভক্ত আচার্য্য উপাচার্য্য প্রচারক গৃহস্থসাধকগণ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ কোলাহলের মধ্যে পড়িয়া ক্রমে পরলোকের সুদূর প্রদেশে গিয়া যখন উপনীত হইয়াছেন, পরবংশের লোকেরা যখন এক প্রকার তাহাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছে, তখনকার অবস্থা অতীব শোচনীয়। তদ্বিবরণ বিস্তারিতরূপে বর্নি করা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর।

সে প্রেমের বসন্ত বায়ু আর এখন বহে না, উৎসাহের আগুনও আর জ্বলে না। আহা! সেকালে আমরা কি গভীর আনন্দে মগ্ন হইয়া উপাসনা মহোৎসব সংকীর্ত্তনাদি করিতাম। শীঘ্র ছাড়িতে ইচ্ছা হইত না। এখনকার অবস্থা দেখিয়া প্রাণ যেন হু হু করে। সমাজের ধনবল জনবল জ্ঞানবল যথেষ্ট বাড়িয়াছে, অন্যান্য বিষয়ে বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। মনুষ্যের পার্থিব ঐশ্বর্য্যে বুদ্ধি ক্ষমতা কৌশলে, কবিত্ব সাহিত্য চিন্তা এবং অভ্যাস অধ্যবসায়ে যাহা হইতে পারে তাহা যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অন্তরাত্মার পিপাসা নিবারণের শান্তিবারি নাই। সব সামগ্রী যেন আলুনি আলুনি। ঘি মসলা যথেষ্ট আছে, কেবল লবণ নাই। অথচ এখনকার লোকেরা তাহাতেই বেশ সন্তুষ্ট। আধ্যাত্মিক যোগানন্দ নাই, তাহা কেহ চায়ও না; ভক্তির মত্ততা প্রেমোচ্ছ্বাস নাই, সুতরাং শান্তি তৃপ্তিও নাই; অথচ তাহার অভাবও কেহ অনুভব করে না। আত্মা অনাহারে চিঁ চিঁ করিতেছে, ভক্তি-বারি অভাবে হৃদয় শুকাইয়া ঝামা হইয়া গিয়াছে; অথচ কাহারো সাড় নাই। বাহিরের কাজে কর্ম্মে সামাজিকতায়, বিবাহে পান ভোজনে, আমোদ কৌতুকে সকলে বেশ হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইত।

ইহাদের দুর্দ্দশা, ধর্ম্মবিডম্বনা দেখিয়া ইদানীং পরলোকগত ঐ সকল

বিবাদপ্রিয় ধর্ম্মাত্মা সাধু ভক্তদিগের জন্য অনেকে আক্ষেপ করিতেন। বস্তুতঃ সেরূপ আত্মত্যাগী উৎসাহী নিষ্ঠাবান ভক্ত ব্রাহ্ম পরবংশে আর প্রায় দেখা যায় নাই। লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেও কি তেমন একটা লোক পাওয়া যায়? বুদ্ধি কৌশলে, নিয়ম নির্দ্ধারণে কিম্বা অর্থসাহায্যে যদি সাধু ভক্ত বৈরাগীজীবন উৎপন্ন হইত, তা হইলে বিচমার্ক এবং রথচাইল্ড স্বর্গরাজ্য গড়িতে পারিত। প্রত্যাদেশ, বিশেষ বিধান এবং ভক্তির যুগ পার হইয়া তাহার পর যুগে জীবিত থাকা এই জন্য বড়ই বিড়ম্বনা। কিন্তু বিধাতার রঙ্গভূমিতে ভীষণ শ্মশান এবং সুরম্য পুষ্পোদ্যান উভয়েরই গভীর তাৎপর্য্য আছে।

এখনকার ব্রাহ্মেরা কাঁদে সকলেই, অথচ কাহারো হৃদয় গলে না, চক্ষে জলও পড়ে না। কথায় উৎসাহ চোট পাট ভাবুকতা যথেষ্ট, অনেক উচ্চতর মতের ব্যাখ্যাও হয়, কিন্তু তাহা কাহারো আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সমাজে আসিয়া সকলে ভাল ভাল কথা শুনে এবং বলে, ভক্ত মহা-জনগণের নাম এবং দৃষ্টান্ত উপদেশ উল্লেখ করে, তথাপি তাহাতে কাহারো জীবনের গতি ফেরে না।

একে নিরাকার অনন্ত ঈশ্বর উপাস্য দেবতা, তাহাতে স্বাধীন চিন্তা ব্যক্তিগত আদেশের ধর্ম্মমত তাহার উপর আবার যদি অবিশ্বাস অভক্তি কাপট্য আসিয়া জোটে, তবে সে ধর্ম্মের বড়ই দুর্দ্দশা। ইহা ব্যতীত পূর্ব্ব শতাব্দীর কোন কোন প্রবীণ ও প্রধান সাধক এবং ধর্ম্মপ্রচারকের উচ্ছৃঙ্খল মত অনুষ্ঠান রহস্যবাদ, অদ্ভুত এবং গুপ্ত সাধন ভজন দ্বারা সমাজের অনেক অনিষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের শেষ জীবন দ্বারা এইটি প্রমানীত হয় যে ব্রাহ্মসমাজে সিদ্ধাত্মা কেহ বুঝি আর তবে হইতে পারে না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হইত, হায়! এমন সহজ জ্ঞানের সার সুমিষ্ট সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ ভক্তির বিধান কি তবে অনিত্য পদার্থের ন্যায় কালে একবারে লোপ হইয়া যাইবে? বস্তুতঃ তাহারই লক্ষণ সে সময় জাজ্বল্যমান দেখা যাইত। কার কত টুকু আন্তরিক সরল বিশ্বাস তাহা বুঝিবার যো ছিল না। অনুতাপও করে, গম্ভীর ভাবে ম্লান মুখে নিজ নিজ দুর্গতির কথাও বলে, বিনম্র ভাবে কাঁদিয়া প্রার্থনাও করে, আবার ঠিক তাহার অব্যবহিত পরক্ষণে হাসি ঠাট্টা ইয়ারকি বাচালতা। তার সঙ্গে অহঙ্কার আত্মাভিমানও বিলক্ষণ।

প্রকৃত ধর্ম্মভাব থাক না থাক, বক্তৃতার অত্যন্ত প্রাবল্য ছিল। সংক্ষেপে কেহ একটু আপনার অভাবানুযাই প্রার্থনা করিবে, তাহাতেও বক্তৃতার ধরন। অভাব তৃষ্ণা থাকে তবে না? সুতরাং সেখানে আমার পরিবর্ত্তে "আমাদের কিছু হইল না। আমরা বড় পাপী।" ইত্যাদি বহু কথা বাহির হইয়া পড়ে। "আমাদের ভক্তি নাই, পুণ্য নাই, বিনয় বৈরাগ্য কিছুই নাই" এইরূপ কথা পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া শেষ "হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা কত কাল আর মোহনিদ্রায় মগ্ন থাকিবে? উঠ! জাগ্রত হও!" এই বলিয়া প্রার্থনা শেষ করে।

যিনি উপদেষ্টা আচার্য্য উপাচার্য্য তাঁহাকে অনেক বাক্য ব্যয় করিতে হয়, কাজেই তাঁহার মিথ্যাচরণ আরো অধিক। ভগবান যেন বক্তৃতা-প্রবৃত্তি চরিতার্থের একটী উপলক্ষ। উপাচার্য্য আরাধনা করেন তাহা যেন তর্ক বিচারের পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্ত। আরাধনা দ্বারা সাধক কোথায় ব্রহ্মস্বরূপের সহিত নিজচরিত্রের সংঘর্ষণে দেবভাব উৎপাদন করিবে, তা নয়, কেবল বর্ণনাই চলিতেছে। কাব্য অলঙ্কার অনুপ্রাস রূপক কবিত্বের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শনে শরীর রোমাঞ্চিতও হয় না, হৃদয়ে উচ্ছ্বাসও উঠে না। যেন কাষ্ঠ পাষাণের পূজা হইতেছে। কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁহাকে আরাধনা করিয়া পায় না, সেই আরাধনার প্রতি ব্রাহ্মগণের শেষ বড়ই বিরক্ত ধরিয়াছিল। কেহ কেহ বলিত, "ইহার আবার অদল বদল কি? সবই ত এক রকম শুনি।" কাজেই তাহা ক্রমে উঠিয়া গেল। তৎসঙ্গে ধ্যানেরও অন্তর্দ্ধান হইল। "সেই দেবতার বরণীয় জ্ঞান শক্তি ধ্যান করি" এই কয়টা কথা শেষ হইতে না হইতে "অসতো মা সদ্গময়"। আরাধনা ধ্যান সব গেল, রহিল কেবল উপদেশ। কাজেই উপাসনা ক্রমে বেশ সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। এত সংক্ষিপ্ত হইল, যে নাই বলিলেই হয়। কি সজনে, কি বিজনে কোথাও তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে যাঁরা সংক্ষিপ্ত উপাসনা ভালবাসিতেন, অতি-সংক্ষিপ্ত উপাসনা দেখিয়া তাঁহারাও ক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন। এইরূপে অনেকে শেষ উপাসনা প্রার্থনা সৎপ্রসঙ্গ নামকীর্ত্তন শাস্ত্রপাঠ ছাড়িয়া দিল। ভিতরে বিশ্বাস ভক্তি নাই ভাল লাগিবে কেন? ইহার অপরিহার্য্য নিয়মে দীর্ঘ প্রার্থনা এবং লম্বা উপদেশও সমস্ত কমিয়া গেল। সে সকল বৃথা বাক্যব্যয় সময় নষ্ট মনে হইত।

এক দল বহুদর্শী আত্মতত্ত্ব* এবং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ সাধক ভক্ত না থাকিলে ধর্ম্মসমাজের এইরূপ দুর্দ্দশাই হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্ব লক্ষণ পূর্ব্ব শতাব্দীর শেষভাগেই দেখা দিয়াছিল, ক্রমে তাহা বংশান্তরে আরো প্রবল হইয়া উঠে।

গত বিষয় আলোচনা করিতে করিতে এক্ষণে আমি বিংশ শকের শেষে আসিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু হায়! এখন আমি চারিদিকে এ সব কি দেখিতেছি? আমি কি পরলোকে? না ইহ লোকে? পূর্ব্ব শতাব্দীর সেই গৃহবিচ্ছেদের এই কি চরম ফল না কি? হায় তার পর আর কি একটীও ভাল লোক জন্মিল না! দেখিতে দেখিতে কি শোচনীয় অবস্থাই উপস্থিত হইল। অন্ততঃ ধর্ম্মটা থাকিবে আশা ছিল। কিন্তু এ কি নরপূজা, না জড়পূজার ধর্ম্ম, তাই এত বিঘ্নের মধ্যে থাকিবে? নিরাকার চিন্ময়ে প্রেম ভক্তি, সংসারে যোগ বৈরাগ্য কি এই ভয়ানক মহাসভ্যতার বৈদ্যুতিক যুগে সম্ভব? আহা! ভক্ত কেশব পঁচিশ বৎসরের প্রাণগত চেষ্টায় এই রুচিটী জন্মাইয়া দিয়াছিলেন, প্রাচীন ঋষিধর্ম্মকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতি সে স্বর্গের বস্তুকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিল। হায়! আর কি তাহা ফিরিয়া আসিবে না?

জীবনের সাধন, চরিত্রের ধর্ম্ম যখন বিলুপ্ত প্রায় হইল, তখন ট্রাষ্ট ডিডের নিয়ম রক্ষার অনুরোধে কেবল সামাজিক উপাসনাটী চলিত। কিন্তু তাহাতে কৃত্রিমতাই বেশী, স্বাভাবিকতা কম। স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলে মিলিয়া খুব গান গাহিত, নিয়মে বসিত, নিয়মে উঠিত, এই সঙ্গে মহাজনদিগের ভাবের নকলও করিত। ইহাতে আরো অপরাধ বৃদ্ধি হইল। রোগীর পক্ষে দুষ্পাচ্য গুরুপাক ভোজ্য যেমন অনিষ্টকর, সাধনহীন মোহ-বিকারগ্রস্ত জীবের পক্ষে সাধু মহাজনগণের অবলম্বিত ভজনপ্রণালী তেমনি মৃত্যুর কারণ।

সাধন ভজনের যখন এই দশা ঘটিল, তখন আচার ব্যবহার, স্বভাব চরিত্র নির্ম্মল এবং সাত্ত্বিক থাকিবে ইহা আশা করা যায় না। বহু পূর্ব্বে হিন্দুস্থানীরা বলিত, "ব্রহ্মধর্ম্ম স্রেপ্ খানে পিনেকা ওয়াস্তে" ঠিক এখন তাই ঘটিয়াছে।* কেবল ব্রাহ্মসমাজের কেন? খানা পিনা আর বিবাহ, ইহাই সকল সমাজের এখন ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। এক সময় ব্রাহ্মেরা যে শুদ্ধাচারী ঋষি তপস্বীর ন্যায় ছিলেন, তাহা শুনিলে আধুনিক যুব-

কেরা হাসে। বলে, "কি অসভ্যতা! এত ইংরাজি লেখা পড়া শিখিয়া নিরামিষ ভোজন, স্বহস্তে রন্ধন, বৈরাগী সন্ন্যাসীর মত আচরণ! কি নির্ব্বোধই তাহারা ছিল। শরীরকে কষ্ট দিয়া লাভ কি ?"

সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে মাচ মাংস অণ্ড এবং পশুরক্তের ছড়াছড়ি হইত। চুরট পাইপ হুঁকা তামাকের ধোঁয়ায় নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইত। গোপনে গোপনে কিছু কিছু মদরিকাও প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব যুগে ব্রাহ্মদের যে একটা নৈতিক বিশেষত্ব ছিল, ইদানীং আর তাহা বড় টের পাওয়া যাইত না। সব ম্লেচ্ছ ব্যবহার। প্রাচীন কালের সাধকগণ সদাচারের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছিলেন, তাহা আর নয়নগোচর হয় না। কেমন করিয়াই বা হইবে ? পান চিবাইতে চিবাইতে গুড়ুক টানিতে টানিতে কি কখন যোগ সাধন হয় ? না মেষ মহিষ গো শূকর পেটে পুরিয়া টেবিলে পা ছড়াইয়া হরিসংকীর্ত্তন চলে ?

এই সকল কুব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া সরল বিশ্বাসী সাত্ত্বিক হিন্দুরা বলিতেন, "আমাদের প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর কিছুই নাই ; এ সময় যদি ভক্ত কেশবের প্রচারিত সেই নববিধান প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিগণের নাম রক্ষা পাইত।"

এক জীবনে ভাল মন্দ দুই কালের অবস্থা যাহারা স্বচক্ষে দেখে তাহাদেরই বড় ক্লেশ। অন্য সকলে বেশ আমোদ আহ্লাদে দিন কাটায়। আত্মগরিমা, পারস্পারিক প্রশংসাই তাহাদের পরম ধর্ম্ম। "কেমন বিধিবদ্ধ নিয়মপ্রণালী করিয়াছি। কাহারো আর মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই! সব সমান।" এই বলে, আর তলে তলে একে অন্যের মন যোগাইয়া চলে। সাধন ভজনের কথা শুনিলে ঠাট্টা করে। আদেশের মত শুনিলে বলে, "সে আবার কি ? ভূতের গল্প না কি ?" এইরূপে শেষ অনেকে নাস্তিক হইয়া গেল। অথচ তাহারা সমাজের সভ্য। সভ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ কর্ত্তাভজা, প্রেতপূজক, থিয়োসফিষ্টও ছিলেন।

কোন প্রবীণ ধর্ম্মাত্মা যদি বৈরাগ্য যোগ বিষয়ে উপদেশ দেন, তাহা শুনিয়া যুবার দল গর্ব্বিত ভাবে উত্তর দেয়,—"দাঁড়াও। আগে তোমার মত বুড় হই, তার পর সাধন ভজন করা যাবে। ভোগ সুখ আমোদ বিলাসের চূড়ান্ত করিয়া শেষ বয়সে উপদেশ ঝাড়তে এসেছ বাবা! আমাদের বয়সে তুমি কি করিতে ?"

ক্রমে ক্রমে ভক্তিটুকু যখন সমস্ত শুকাইয়া গেল, সাত্ত্বিক আচার ব্যবহারের স্থানে রাজসিক এবং তামসিক কর্ম্মকাণ্ড সার হইল, তখন ইহার পুনঃসংস্কারের জন্য বিধাতা অন্যদিক্‌ দিয়া ভক্তি বিশ্বাস যোগ বৈরাগ্যের স্রোত খুলিয়া দিলেন। সামঞ্জস্যাবতার ভক্ত কেশবচন্দ্রের পুনরুত্থান দেখিবার জন্য এই সময় আমি উর্দ্ধদিকে চাহিয়া থাকিতাম। কবে আবার হরিপ্রেমে বঙ্গদেশ মাতিবে, ভক্তিজলে সকলে ভাসিবে, আহ্লাদের পদ্মফুল ফুটিবে, গভীর যোগানন্দে অন্তরাত্মা ডুবিবে, প্রাণ ভরিয়া এইটী দেখিব বলিয়া প্রতীক্ষা করিতাম্‌। আধুনিক ব্রাহ্মযুবকগণ, তোমাদের মুখপানে চাহিলে আমার কত কথাই মনে আসে! তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি এক এক জন সামান্য লোক ছিলেন? আহা! যেমন তাঁদের ভাব ভক্তি তেমনি যোগ বৈরাগ্য উদ্যম উৎসাহ। উৎসবের সময় দেশ দেশান্তর হইতে দলে দলে ভক্তবৃন্দেরা আসিতেন, কত নৃত্য গীত, কত আমোদ আহ্লাদ! সে সব কথা আর কত বলিব! ভাবিলে এখন চক্ষে জল আসে। হায় টাউনহল, ব্রহ্মমন্দির, বিডন পার্ক, রাজপথ! এক সময় কি অপূর্ব্ব শোভাই তুমি ধারণ করিয়াছিলে! যতই সে সব মনে পড়ে, প্রাণটা যেন কেঁদে কেঁদে উঠে। তাই মনের দুঃখে বসিয়া গান করি,—"হায় কোথা গেল সুখের নববৃন্দাবন! প্রেমিক ভক্তের মেলা যোগসম্মিলন। এ ভব-শ্মশানে আর, হবে কি প্রাণ সঞ্চার; বহিবে কি বিধাতার নিশ্বাসপবন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে বিংশ শতের শেষভাগে আবার বাতাস ফিরিল। বিধাতার কার্য্যের গতি কে বুঝিতে পারে? ব্রাহ্মসমাজে আর কিছু এ সময় থাকুক না থাকুক, সামাজিক মিলন, লৌকিক ভদ্র ব্যবহার বেশ ছিল। শিক্ষিতসমাজে পৌত্তলিকতা এবং জাতিভেদ উঠিয়া যাওয়াতে সামাজিকতার রাজ্য কিছু বিস্তার হইয়া পড়ে। এই জন্য জাতিনির্ব্বিশেষে সংস্কৃতমনা উন্নতিশীল শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একেশ্বরবাদী হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টীয়ান ব্রাহ্ম, এই সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের পরস্পরের মধ্যে

বিবাহে আদান প্রদান চলিত, একত্র পান ভোজন এবং সাধারণ হিত-কর কার্য্যে পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃভাব প্রেম বিনিময় হইত। এ সময়ে এক শ্রেণীর শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত কতকগুলি পরিবার জন্মিয়াছিলেন, যাঁহাদিগকে ১৮৭২ সালের বিবাহের তিন আইন অনুসারে অভিহিত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ "আমরা হিন্দু নই, মুসলমান নই, যিহুদী পার্সী খ্রিষ্টীয়ান নই, কিছুই নই; এই তাঁহাদের লক্ষণ। ইঁহারা চুক্তির নিয়মে, কেহ কেহ বা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া, বিবাহ করিতেন। কোন দলবিশেষে তাঁহারা ভুক্ত হন নাই। ধর্ম্মবিষয়ে এইরূপ অসাম্প্রদায়িক উদার ভাবের চিহ্ন সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই দেখা যাইত। খ্রিষ্টীয়ানেরা হিন্দু যোগী ঋষি ভক্তের এবং হিন্দুরা ঈশা মুশা শাক্য মহোম্মদের ছবি দ্বারা ঘর সাজাইতেন, তাদের জীবনচরিত পড়িতেন। গোঁড়ামি, অন্ধতা, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল।

এই সঙ্গে আর একটী আহ্লাদের সমাচার না লিখিয়া আমি লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্ব শতাব্দীর যে কয়টী দেশীয় ভদ্র খ্রিষ্টী-য়ান পরিবার ইংরাজ পাদরীদিগের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে স্বাধীন মণ্ডলী স্থাপন করেন, তাহাদের সহিত ব্রাহ্মবিশেষের বেশ সখ্যভাব জন্মিয়া-ছিল। এক্ষণে সেই কয়টী পরিবারসম্ভূত নরনারী সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। তাহারা দিব্যজ্ঞানে বুঝিয়া দেখিলেন, "ব্রাহ্মেরা যিশুকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধার সহিত বাইবেল পড়ে, খ্রিষ্টের জন্ম এবং স্বর্গারোহণ দিবসে প্রার্থনাদি করে, ভাবের ঘরে আর ত কোন প্রভেদ নাই, তবে আর আমরা এক দেশ এক জাতি এক পরিবারের লোক হইয়া কেন মিছা স্বতন্ত্র থাকিব?" এই বলিয়া যোগ দিয়াছেন। বেশ করিয়াছেন। কেনই বা দিবেন না?

সুশিক্ষিত ভদ্র মহিলাদিগের সহায়তায় এইরূপ মিলনের কার্য্য আরও অনেক অগ্রসর হয়। সমস্ত সম্প্রদায়ের নব্য সভ্য মহিলাগণ মধ্যে মধ্যে এক সঙ্গে মিশিতেন। সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মে সভা সমিতিতে সখের বাজারে এক সঙ্গে ভোজনাদিও হইত। মেয়েতে মেয়েতে ভাব হইলে তদধীন পুরুষদিগের মধ্যে সহজেই প্রেম সঞ্চার হয়। স্ত্রীজাতি প্রেমের অবতার। তাহাদের প্রভাব অনতিক্রমণীয়।

কেবল যে খ্রিষ্টীয়ানেরা আসিলেন তাহা নহে, হিন্দুধর্ম্মের দোফলা ফল

হরিসভা, আর্য্যসভা ইত্যাদিও এই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে আসিয়া পড়িলেন। উন্নতিশীল হিন্দু এবং উদার খ্রিষ্টীয়ানগণ ব্রাহ্মদিগের শৈশবাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। নব্যহিন্দুগণ এ কথা অগ্রে বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু এইরূপই ভবিতব্য ছিল। যাই হউক, তাঁহারা না বুঝিলেও কোন ক্ষতি হয় নাই; এ যাবৎ কাল তাঁহারাও অজ্ঞাতসারে জাতীয় সাধারণ এবং সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মোন্নতির কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। এ জন্য হরিসভা এবং আর্য্যসভার দলপতি মহাশয়দের আক্ষেপের কোন কারণ দেখি না। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, ইহাই সকলে চায়। তোমার আমার প্রদত্ত একটা নাম সংজ্ঞা নাই বা রহিল?

রাজনৈতিক আন্দোলন, কংগ্রেস সভা, সমাজসংস্কার এবং অন্যান্য বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে নানা সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইতেন তাহাতে অলক্ষিতভাবে ভ্রাতৃভাব বিস্তার হইয়া পড়ে। ইহাও মহাযোগ এবং মহামিলনের একটী প্রধান সহকারী হইয়াছিল।

বাহিরের উদারচেতা কৃতবিদ্য উন্নতমনা লোকেরা যখন এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মেরা কিছু লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। পরস্পরে বলাবলি করিতেন, "ভাই, এ সময় আর গৃহবিবাদ রাখা উচিত হয় না। আমরা যদি তিন দল এক হইয়া গৃহবিবাদ ভঞ্জন করিতাম, দেশের সমস্ত ভদ্রলোক ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দিত। তারা আসে, এসে এসে চলে যায়। এস, আমরা ভাল হই, এবং ঘরাও বিবাদ মিটাইয়া ফেলি।" তিন সম্প্রদায়ের তিনটী লোকের মনে প্রথমে এই ভাব উদিত হইল। তাঁহাদের যত্ন চেষ্টা প্রার্থনা পরিশ্রমে শেষ তিন হইতে তিন দল এক হইয়া গেলেন। "একে তিন, আবার তিনে এক।"

আদি এবং সাধারণ ব্রাহ্মেরা বলিলেন, "এস আমরা এক হই। কারণ, আমাদের মধ্যে মতামতের বিশেষ ত কোন প্রভেদ নাই। সামাজিক ব্যবহারের যাহা কিছু অনৈক্য। তাই বা বেশী এমন কি।" তাঁহারা হাসিয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে কিছু ভেদাভেদ ছিল বটে। তখন আমরা হিন্দুয়ানির এবং দেশাচারের কিছু বেশী পক্ষপাতী ছিলাম। অধিক আর কি, ক্রিয়াপ্রণালীর এবং রুচির কিছু প্রভেদ ছিল। ব্রাহ্মণেরা পৈতা লইতেন এবং রাখিতেন। এবং তাঁহারা বৈদেশিক অনুকরণের বিরোধী ছিলেন।

এখন পৈতা রাখা আর না রাখা দুই সমান? আচার ব্যবহারও সব ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। এ বিলাতি সভ্যতার মুখে কি আর কিছু টেঁকে?" পরে উভয়ে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া সব বিবাদ মিটাইয়া লইলেন। কার্য্যক্ষেত্র উভয়ের স্বতন্ত্র থাকিল, কিন্তু অনেকানেক কার্য্য এক যোগে চলিতে লাগিল।

তদনন্তর সাধারণের সঙ্গে নববিধানবাদীর মিলন। শেষোক্তেরা বলিলেন, "যদি তোমরা ভাই, আদেশ, মহাপুরুষ, বিশেষ কৃপা এবং যুগধর্ম্ম বিধান স্বীকার কর, আর দেশীয় ভাবের দিকে একটু ঝোঁক রাখ, উপাসনা আধ্যাত্মিক যোগ, ভক্তিসাধন এবং সাত্ত্বিক আচার ব্যবহারের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুরাগ দেখাও, তাহা হইলে মতের গোলটা অন্ততঃ মিটে যায়। অবশ্য আমি যে এ সকল বল্‌ছি, তাঁর মানে ইহা নয় যে আমি এক জন খুব বড় সাধক বা সিদ্ধ পুরুষ; ভাল ভাল মত কতকগুল শিখিয়াছি এই মাত্র। ব্যবহারে এখন প্রায় সব সমান হইয়া উঠিয়াছে। এ সকল লইয়া বিবাদ করা বৃথা।

সাধারণ। তা বই কি, কেন আর মিছে গণ্ডগোল? আগে যাঁদের লইয়া বিবাদ হইত, তাঁহারা ত এখন স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, মতামতের প্রভেদ যাহা কিছু ছিল, তাহা মনে করিলে ইতিপূর্ব্বেই তাঁরা মিটাইয়া যাইতে পারিতেন। কে এমন নরাধম অকালকুষ্মাণ্ড আছে যে, প্রার্থনা করে, অথচ বিশেষ কৃপা মানে না;—কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে চায়, অথচ দৈবাদেশ বিশ্বাস করে না;—যোগধামে পুণ্যলোকে যাইবার জন্য সাধনের পথে বাহির হইয়াছে, অথচ সে পথের অগ্রগামী পথিক সাধুদিগকে মানে না? সকলেই এক্ষণে আমরা অধোগামী হইয়া পড়িয়াছি, এই আক্ষেপের বিষয়। আসল কথা ভেঙ্গে বলিতে আর এখন লজ্জা ভয়ই বা কি, আর গুমরই বা কি। ফলে দলাদলি গোঁড়ামি আর ভাল লাগে না। ভ্রাতৃভাব লইয়া বিষয়। ঈশ্বরপ্রেম আর ভ্রাতৃপ্রেমের অভাবেই যত বিবাদ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তোমার কাছে যদি একটু ভালবাসা এবং ভাল উপাসনা শুনিতে পাই, তাহা হইলে তুমিই আমার দলের লোক। সত্যের জন্য যে দলাদলি, তাহাতে কখন প্রেমের অভাব হয় না, আবার গোড়ায় যদি প্রেম থাকে, সত্যে সত্যে মিলিয়াও যায়, অসত্য পরাস্ত হয়।

বিধানবাদীও মন খুলিয়া বলিবেন, "তুমিও যেমন ভাই, কেউ কারো নয়। লোকে যদি জিজ্ঞাসা করে, বুঝাইয়া বলিতে পারি না কেন দলাদলি

করি ? আমরা দুইজনে যদি সরলহৃদয়ে ভক্তির সহিত দীনাত্মা হয়ে ভগবানকে ডাকি, তাতে কি উভয়ে শান্তি পাই না ? তাঁহার চরণতলে যে মিলন সেই আসল। চরিত্রটা ভাল হবে, আর হরিভক্তি থাকবে, এইটী কেবল চাই। নতুবা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিতে কেবল অহঙ্কার আর বিবাদ ; ঘরেও বিবাদ, বাহিরেও বিবাদ। পূর্ব্বযুগের দলপতিরা যখন বাঁচিয়াছিলেন, তখনও তাঁহাদের ঘরে ঘরে মহাবিবাদ হইত, কেহ কাহারো মুখ দেখিতেন না। আপনার মতের এবং সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে যখন এই, তখন অন্য পরে কা কথা ? ঈশ্বরের চক্ষে এ সব প্রভেদ অগ্রাহ্য। আমরা তাঁর পানে চাহিয়া কি দলাদলি করি ? না নিজের অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে করি ? যে একটু অনুগত, সেই হয় আপনার। এ সব অতি নীচ ভাব এবং নিকৃষ্ট মায়া। যে মানুষকে পর ভাবে, সে অখণ্ড ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করে, যে দল বাঁধে, সে সর্ব্বভূতস্থ পরমাত্মাকে অন্য দলে দেখিতে পায় না।

সাধারণ। যে সকল গুরুতর বিষয়ে মতভেদ থাকিলে মিলন অসম্ভব হয়, তাহা এখন ত এক প্রকার মিটিয়াই গিয়াছে। রামমোহন, দেবেন্দ্রকে ভক্তি করিব, আর যাঁর কাছে উপাসনা প্রার্থনা ধর্ম্মসামঞ্জস্য ভক্তি বৈরাগ্য ঋষিধর্ম্ম শিখিলাম তাঁহাকে মানিব না ? এটা যে নিতান্ত অস্বাভাবিক কথা ! বিলাতি সভ্যতার অনুকরণ, কি সমাজসংস্কার, কিম্বা বুদ্ধি বিচারের ধর্ম্মাধর্ম্ম, ইহাতেই বা আর কার কত দিন চলে ? একটু ভক্তির উদয় হইলে এ সকল অসারতা অভিমান আপনিই দূর হইয়া যায়। এখানে আর লৌকিক কুটুম্বিতা খাটে না। যে মুক্তির সহায় সেই পরমাত্মীয়। সাধনের পথে সাধুভক্তের সহায়তা আশীর্ব্বাদ না হইলে চলিতেই পারে না। এ জন্য আর বিবাদ করা কেন ?

নববিধান। একটু ভক্তির জন্য আমরা এখন সকলেই লালায়িত। বৈরাগ্য ত আর দেখাই যায় না। যাহা কিছু আমাদের বিশেষত্ব ছিল, তাহা সাধারণ হইয়া গিয়াছে। নূতন পঞ্জিকার "নূতন" শব্দ এখন পুরাতনে পরিণত হইয়াছে। নবজীবন ব্যতীত নববিধান রক্ষা পায় কি ? সকলেই এখন আমরা বিপদ্‌গ্রস্ত। এ সময় একসঙ্গে মিশিয়া এস, ভগবানের নিকট গিয়া কাঁদি, তাঁর প্রসাদ ভিক্ষা করি। যাহাতে আবার বিধানের স্বর্গীয় বাতাস প্রবাহিত হয় তার জন্য উর্দ্ধদিকে চেয়ে থাকি। নৈলে কেহই বাঁচিব না। কতকগুলি বড় বড় ডক্ট্রিন্ লইয়া গোল করিলে কি

হইবে? জীবনে তাহার বিকাশ হওয়া চাই"। এ সময় আমাদের অবিশ্রান্ত প্রার্থনা আর ক্রন্দন ভিন্ন অন্য গতি নাই।

সাধারণ। বেশ বলেছ দাদা, (ছল ছল নেত্রে) এস, একবার কোলা-কোলি করি। তোমাদের ভাল ভাল কথাগুলি শুনলেও হৃদয়টা ঠাণ্ডা হয়। বলব কি ভাই, বলিতে লজ্জা করে, ঘরের মধ্যে পঞ্চাশটা দল। মেয়েগুলা চক্ষে আঁধার দেখছে। ত্রাহি! ত্রাহি। করিতেছে। এক দেবতা এক বিধান, এক আচার্য্য, এক শাস্ত্র মানিয়াও তোমাদের জনে জনে দল! এতে কি প্রকাশ পায়? সত্যের অনুরোধ, না ধর্ম্মজ্ঞানাভিমান, ভ্রাতৃবিরোধ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মূল কারণ? দূর করে দাও। ভেঙ্গে চুরে সব একাকার করে ফেল। এস আগে প্রাণটা বাঁচাই। পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মভক্তগণ প্রথমে যখন একহৃদয় হয়েছিলেন, তখন কি এরূপ মতভেদ কিছু ছিল? না কেহ তাহা জানিত?

নববিধানবাদী আর উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "ধর্ম্ম-ভাব কমিলেই বুদ্ধির ধর্ম্মের বিকট দন্ত বাহির হইয়া পড়ে। যে প্রেমিক সাধু ভক্ত, সে কি আর দল মানে? বক্ষ বিস্তার করে, সকলকে আলিঙ্গন পাশে বেঁধে সে বলে, "বিসার গেই সব তত্ব পরাই। নাই কৈ বৈরি, নাহি বেগানা, সকল সঙ্গ হামারি বনি আই।"

ভ্রাতৃবিচ্ছেদে গৃহবিবাদে জ্বলিয়া পুড়িয়া জ্বালাতন হইয়া এইরূপে দলত্রয়ের কয়েকটী ব্রাহ্ম নিজ নিজ ত্রুটি স্বীকার-পূর্ব্বক একণে এক দল বাঁধিলেন। পরে যাঁহারা একটু উন্নত-চরিত্র, ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন, তাহারা এই সঙ্গে ক্রমে যোগ দিয়া যোগ বৈরাগ্য ভক্তি সাধন, চরিত্র শোধন এবং ভ্রাতৃপ্রেমের উন্নতির জন্য বিশেষ রূপে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহারা প্রথমেই স্থির করিলেন, "আইস, আমরা পূর্ব্বগত ব্রহ্মপরায়ণ ধর্ম্মপিতা এবং পিতামহ ভক্তদিগের জীবনচরিত এবং তাহাদের উপদেশাবলী পাঠ করি এবং তাহার সহিত নিজ চরিত্রকে মিলাই।"

ভূভারহারী ভগবান্ ঠিক সময়ে এই কয়টী বিশ্বাসী সদাত্মাকে এক জায়গায় করিয়াছিলেন।

অনন্তর এই সকল নবানুরাগী পিপাসু যুবকগণ যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মব্যাখ্যান, ব্রহ্মানন্দ কেশবের জীবনবেদ, সেবকের নিবেদন, নব-সংহিতা, দৈনিক প্রার্থনা, ব্রহ্মগীতোপনিষৎ True Faith, Regenerting

Faith, Godvidion ইত্যাদি পুস্তক ভক্তির সহিত পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহাদের মুখে হাসি বাহির হইল। আশার আলোকে যেন স্বর্গের সোপান তাঁহারা সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

গত এক শত বৎসরের নানা প্রকার বিঘ্ন বিপদে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানের অক্ষয় বীজ একটীও বিনষ্ট হয় নাই। তাহা হইবার নহে। পুনরায় সুসময়ে তাহা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রপ্রণীত ইংরাজি বাঙ্গালা উপদেশ এবং ব্রাহ্মভক্তবৃন্দের রচিত সঙ্গীতাবলী সাধারণ্যে ইতিপূর্ব্বেই এত দূর পর্য্যন্ত বিস্তার হইয়া পড়িয়াছিল। যে অল্প মূল্যে ঐ সকল গ্রন্থ ছাপাইয়া যে সে লোক, যেখানে সেখানে বিক্রয় করিত। রামায়ণ মহাভারত বেদ ভাগবতের ন্যায় তাহা এখন সাধারণের সম্পত্তি।

এইরূপে যখন সকল দিকেই অনুকূল বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল, তখন ঈশ্বরপ্রেরিত মিলনকারী উপরি উক্ত অনুরাগী ব্রাহ্ম কয়েক জন আলোচনা দ্বারা স্থির করিলেন, "ভক্তজীবনের সহায়তা ভিন্ন আমরা এ বৃহৎ সমাজ রক্ষা করিতে পারিব না। হরিভক্তের হরিপ্রেম ব্যতীত ধর্ম্মসমাজ ভ্রাতৃমণ্ডলী কি রক্ষা হয়? আমরা নরপূজা, গুরুবাদ ঘৃণা করি, কিন্তু ভক্তের আশীর্ব্বাদ, সঞ্চারিণী শক্তি অবনতমস্তকে গ্রহণ করিব। তাঁহাদের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিব। আমরা শিশু, মাতৃস্তন্য চাই, প্রতিপালিকা ধাত্রী চাই। অতএব ভক্তবর মহাত্মা বিশ্বম্ভরকে গিয়া চল আমরা ধরি।"

সকলে এক মত হইয়া অধ্যক্ষ সভাকে জানাইলেন, পরে প্রধান প্রধান সভাগণ বিশ্বম্ভরকে নেতৃত্ব পদে বরণ করিবার জন্য তাহার নিকট এক বিনীত এবং ব্যাকুল আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। আবেদন পাইয়া তিনি ভগবৎপ্রেরণার জন্য শুভ সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গভীরা যামিনী, গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন নীরব নৈশ আকাশ কাঁপাইয়া সেণ্ট্রাল ব্রহ্মমন্দিরের ঘড়িতে ঢং টং টং, ঢং টং টং, সা রে গা মা সুরে তিন কোয়াটার বাজিয়া গেল, ক্ষণকাল পরে ঢং ঢং ঢং করিয়া বারট বাজিল। ঘন তমসাবৃত গগনতল সেই শব্দতরঙ্গে আন্দোলিত হইল, ক্রমে তাহার ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি অসীম অম্বরের সুদূর প্রদেশে অল্পে অল্পে মিলাইয়া গেল। কদাচিৎ কুক্কুর এবং প্রহরীদিগের কর্কশ রব কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। ঘরে ঘরে নর-নারী ভস্ত্রা যন্ত্রের ন্যায় শাঁ শাঁ শব্দে নিদ্রা যাইতেছে। কাহারো মুখ ব্যাদান, কাহারো দন্ত বিকসিত, কেহ ঢেঁকির আকারে, কেহ কুক্কুর কুণ্ডলী, কেহ বা রেলের পুঁটলী হইয়া ঘুমাইতেছে। কেহ ভূতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় দাঁতে দাঁত ঘষিতেছে, কেহ প্রলাপ বকিতেছে, কেহ বা স্বপ্নে ভয় পাইয়া হক নাহক কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিস্ক্রিয় মেদিনীর শ্রান্ত ক্লান্ত প্রশান্ত বক্ষে অনন্ত কোটী জীব মৃতবৎ নিদ্রিত। জাগ্রত কেবল যোগী, রোগী আর ভোগী। যাহারা আত্মসংযমী বিশ্বাসী চেতনবান্ তাঁহারা এই কাল নিশীথ সময়ে অনন্তের নিঃশব্দ গম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করেন এবং স্থির আঁধার আকাশে তাঁহার মৃদু পাদবিক্ষেপ যোগনেত্রে দর্শন করেন। মোহান্ধ জীব চিরকাল জনকোলাহল-পূর্ণ নগরে, রাজপথে, কার্য্যক্ষেত্রে, স্বজনপরিবেষ্টিত গৃহে বাস করে, সে নির্জ্জন নিস্তব্ধ নিবিড় আঁধারের অদ্ভুত সৌন্দর্য্যরসে বিমুখ। আঁধার দেখিলে সে ঘুমায়, না হয় ভয়ে চোখ বোঁজে। হে দেহাভিমানী, এই সময় একবার মৃত্যুর প্রতিকৃতি দর্শন কর। ভবশ্মশানে শায়িত অচেতন প্রাণিপুঞ্জকে দেখিয়া একবার পরিণাম চিন্তা কর। কে ঘুম পাড়ায়, কেইবা পুনরায় জাগাইয়া দেয়, তাহাও ভাবিয়া দেখ। তোমরা সকলেই নিদ্রিত, দিবসে জাগিয়াও নিদ্রিত, কেবল এক জন দিবা নিশি বসিয়া জাগিতেছেন।

সেই শ্মশানবৎ নিদ্রিত জগতের অঙ্কে এক প্রশান্ত মূর্ত্তি দিব্য লাবণ্যময়ী নারী কোন মুমূর্ষু প্রায় সুন্দর যুবকের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সজলনেত্রে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন। তাঁহার প্রার্থনার স্বর্গীয় প্রভাব স্নিগ্ধ সুমন্দ সমীরণের ন্যায় যুবকের জ্বরাগ্রস্ত দগ্ধ মস্তিষ্কে এবং আশাভগ্ন হৃদয়ের ব্যথিত স্থানে অলক্ষিতভাবে হিল্লোলিত হইতেছিল।

এবং তজ্জন্য কিছু কিছু আন্তরিক চেতনা তাঁহার অন্তঃকরণের গূঢ় প্রদেশে স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল। পক্ষিমাতা যেমন শাবকদিগকে বক্ষে ঢাকিয়া উচ্চাকাশের মুক্ত বায়ুতে উড়িয়া বেড়ায় এবং মধুর কলনাদে মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত করে, শয্যাপার্শ্বগতা রমণী তদ্রূপ ঐ যুবকের দুর্ব্বল অসহায় দেহপিঞ্জরাবদ্ধ আত্মা-বিহঙ্গকে সঙ্গে লইয়া চিদাকাশে সচ্চিদানন্দের প্রেমহিল্লোলে বিচরণ করিতেছিলেন।

যুবকটি কে, পাঠক মহাশয়েরা বোধ হয় এখনও চিনিতে পারেন নাই। ইনি আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত দিবাকর বাবু। মহিলাটী ভগ্নী নিরঞ্জনা।

দিবাকরের এরূপ মুমূর্ষু অবস্থার কারণ অতীব রহস্যজনক। তিনি যে "পতিতোদ্ধারিণী" আশ্রমপ্রাঙ্গণে নিরাশ হইয়া সেই পড়িয়াছিলেন, তার পর আর অন্য কোন কাজ করিতে পারেন নাই। ভক্তিহীন অবিশ্বাসী চিত্ত যখন ঐহিক সুখের আশায় ভগ্নমনোরথ হয়, তখন সে ইহ পরকাল উভয়ই হারায়। এ অবস্থায় ধর্ম্মের কাজ করা বড়ই বিড়ম্বনা। দিবাকরের আশারজ্জু যখন ছিন্ন হইল, তখন তিনি আশ্রয়পাদপবিহীন ছিন্নমূল লতিকার ন্যায় ধূলিবিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। কোন পীড়া নাই, অথচ শরীর দুর্ব্বল। কাজের অভাব নাই, কিন্তু মন শিথিল, উদ্দেশ্যশূন্য। শয়ন ভোজন নিদ্রা ভ্রমণ লোকসঙ্গ আমোদ বিলাস তাবৎ বিষয়ে অরুচি। এ অবস্থায় চিন্তাহীন নির্ব্বোধ মনুষ্যকে নিদ্রাদেবী বড় দয়া করিয়া থাকেন। কিন্তু দুশ্চিন্তা দুঃস্বপ্ন দিবাকরকে ঘুমাইতেও দিত না। কাজেই তাঁহার মাথা ঘূরণির ব্যারাম হইল। সেই সঙ্গে দিন দিন শরীর বিশীর্ণ, মুখশ্রী পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল। তিনি শান্তির আশায় ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা সঙ্গীত শুনিতে যান, বৃথা বাক্যাড়ম্বর তর্ক বিতর্ক বিবাদ দেখিয়া ভগ্নান্তঃকরণে ফিরিয়া আসেন। মনে মনে ভাবেন, "ধর্ম্মের নামে এত হিংসা বিদ্বেষ কেন? ইহাদের অপেক্ষা সামাজিক জীব, স্বাধীন চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেক উদার ভদ্র দয়াবান্। ইহারা ভাই ভগ্নীর নিরাকার আত্মাকে নিজের আত্মার এক পার্শ্বে মতের ভিতর ফেলিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আমার প্রাণ যে বড় হু হু করে! ব্যথার ব্যথী সহৃদয় বন্ধু বিনা যে লোকসমাজ অরণ্য সমান মনে হয়। হায় এখন কোথায় যাই! স্বজাতি জ্ঞাতি কুটুম্ব ছাড়িয়া ইংরাজদলে মিশিতে গেলাম, কৃষ্ণবর্ণ মেষ (ব্ল্যাকশিপ্) বলিয়া তাহারা তফাৎ করিয়া দিল। ব্রাহ্মদলে মিশিলাম, সেখানেও সুখ পাইলাম না।"

দিবাকর ইদানীং সমাজের গণ্ডগোল দেখিয়া বলিতেন, "ধর্ম্মধ্বজী মিথ্যাবাদী লোক অপেক্ষা সত্যবাদী দয়াবান্ নাস্তিক শ্রেষ্ঠ। যাহারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়ায়, তাদের মধ্যে দেখি অধিকাংশই শঠ, ধূর্ত্ত, কপট।"

তিনি বড় সত্যপ্রিয় এবং সত্যানুসন্ধায়ী ছিলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিগূঢ় তত্ত্ব, প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করিতেন। অসার ভাবুকতা, কল্পনা ভাল বাসিতেন না। তাহার কূট প্রশ্ন শুনিলে নিতান্ত যে কুতার্কিক বিচারপ্রিয় তাদেরও প্রাচীন সংস্কারে আঘাত লাগিত।

অতঃপর বিরক্তি নিরাশা এবং অশান্তিজন্য যুবকের মস্তিষ্কে এক স্থায়ী উৎকট পীড়া জন্মিল। পিত্তাধিক্য এবং মন্দাগ্নি বশতঃ শরীর শীর্ণ, পীতবর্ণ, কঙ্কালসার হইয়া উঠিল। রোগের জ্বালায় মনঃপীড়ায় দিবাকর শেষ এত দূর পর্য্যন্ত বিরক্ত অশান্ত হইয়া পড়িলেন, যে আত্ম-হত্যাকেই সুখের বিষয় মনে করিতেন।

পীড়ার অবস্থায় তাহার সেবা শুশ্রূষার ভার তপোবনবাসিনী দয়ার ভগিনী মহিলাদিগের উপর সমর্পিত ছিল। অদ্য রাত্রে নিরঞ্জনার পালা। রোগযন্ত্রণা এবং মানসিক দুর্ব্বিষহ অশান্তিতে অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া দিবাকর একাকী বিছানায় পড়িয়া ভাবিতেছেন,—"আমার বর্ত্তমানের এক দিনের জীবনও যা, ভবিষ্যতে যত দিন বাঁচিব তত দিনের জীবনও তাই, কেবল পুনরাবৃত্তি মাত্র। সুখকর পরিবর্ত্তন আর কিছুই ঘটিবে না; অধিকন্তু জরা বার্দ্ধক্য মৃত্যুযন্ত্রণা সম্মুখে। এ অবস্থায় জীবন ধারণ কেবল কষ্ট ভোগ মাত্র। কেন আমি তবে অনর্থক কষ্ট ভোগ করিব? কার আশায়, কিসের অনুরোধে করিব? মৃত্যু ত আমারই হাতে। মরিলে আর কিছু লাভ হউক, না হউক, আপাততঃ এই সকল ক্লেশের হাত হইতে ত মুক্তি পাব! কার জন্য আর মায়া মমতা? আমাকেও কেহ চায় না, সুতরাং আমিও কাহারো নই। হায়! কে আমার ভাবনা ভাবিতেছে? কাহার প্রাণ আমার জন্য টানিতেছে? একটী হৃদয়ও যদি আপনার বলিয়া পাইতাম, তার অনু-রোধে সকল ক্লেশ সহ্য করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতাম। ত্রিজগতে আমার কেউ নাই!"

শেষ কথাটীর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ফাটিয়া তাহার শুষ্ক চক্ষের কোণে এক বিন্দু জল দেখা দিল। দৈহিক এবং মানসিক যন্ত্রণার উপর এইরূপ চিন্তা এবং আন্দোলনে শেষ তিনি এমনি উত্তেজিত অস্থির হইয়া পড়িলেন,

যে বিছানায় আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। হৃদয়ের কলিজার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতেছিল। কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিলেন। পরে জানুতে ভর দিয়া আস্তে আস্তে দাঁড়াইলেন। দিবাকরের রোগজীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ সেই বিশুষ্ক দেহ আত্মনাশ-কামনায় তখন অতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ঠিক যেন উন্মাদের অবস্থা। পরে দেরাজ খুলিয়া, তাহার ভিতরে একটী ক্ষুদ্র শিশি ছিল হাত দিয়া তাহা ধরিলেন। যাই শিশি স্পর্শ করিয়াছেন, অমনি মহাবেগে সর্ব্বশরীর থর্থর থর্থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মাথার চুল, গায়ের লোম সব খাড়া হইয়া উঠিল। তদবস্থায় হঠাৎ তিনি, "তুমি তোমার নও। তুমি আমার।" এই অলৌকিক গম্ভীর বাণী শুনিতে পাইলেন। নিকটে কোন মানুষ নাই, কোন শব্দও শ্রুতিগোচর হইল না, অথচ নিঃশব্দ বাণীর পরিষ্কার মর্ম্ম স্পষ্ট বুঝা গেল। বাণী শুনিয়া সেই উদ্ভ্রান্তমতি যুবা সচকিত নেত্রে এদিক ওদিক একবার চাহিয়া, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া শেষে মুদ্রিত নয়নে বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমার! আহা বড় মিষ্ট কথাটী! কিন্তু "আমার" বলিবার এ হতভাগ্যের কি কেহ আছে?" এই বলিয়া আকুল প্রাণে হৃদয় ভরিয়া খুব খানিক কাঁদিলেন। ক্ষণকাল পরে আবার ভাবিলেন, "না, ও কোন কাজের কথা নয়। আমাকে "আমার" বলিবার কেহ ত নাই।" পুনরায় শিশি ধরিলেন। শিশিটী মুখে তুলিয়া ঢালিবেন, এমন সময় নিরঞ্জনা হঠাৎ আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ মাত্র তৎক্ষণাৎ বিষপাত্র হস্ত হইতে স্খলিত হইল। দিবাকর একটী বার সেই দেবীর মুখ পানে চাহিয়া কণ্টকিত এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

এই অবস্থায় নিরঞ্জনা মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার অঙ্গে হাত বুলাইতেছিলেন। দেবী নিরঞ্জনার কোমল প্রকৃতির শীতল ছায়ায়, করকমলের স্নিগ্ধ সংস্পর্শে এবং তদীয় সহানুভূতিমাখা সুমধুর সান্ত্বনা-বচনে, সর্ব্বোপরি জীবন্ত বিশ্বাস ব্যাকুলতার প্রার্থনায় অচিরে দিবাকরের অন্তরের অন্তরতম গূঢ় স্থানে শান্তি সঞ্চারিত হইল। নবজীবনকুসুম ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তখনও তিনি বাহ্য চৈতন্য-বিহীন মৃতবৎ। দিবাকরের আত্মার নিগূঢ় অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নিরঞ্জনা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

পরে ক্রমশঃ যখন সেই ভগবৎপ্রসাদের স্বর্গীয় প্রতিভা যুবকের

অন্তরাকাশের ঘন অন্ধকারমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন তিনি সহসা এক অভূতপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতি দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "আমি কোথায়। আমার শরীরই বা কোথা গেল! বা! এটা ত বড় আশ্চর্য্য অবস্থা দেখিতেছি। কেবল একা আমি আছি, আর কেহ নাই। আমাতে আমি। আহা। কি গম্ভীর প্রশান্ত দৃশ্য! কি রমণীয় শান্তির রাজ্য। চতুর্দ্দিকে কেবল অনন্ত আকাশ আর নিবিড় অন্ধকার। এর ভিতর হঠাৎ বিদ্যুতের আভার মত কি দেখিলাম। কিন্তু এই যে আমি, এই আমিটাই বা কোথা হইতে আসিল? আমার এই ইচ্ছা, ভাব, জ্ঞান সমস্ত কি আমি নিজেই উৎপাদন করিতেছি?"

আঁধার বিজনে অসীম আকাশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আপনাকে আপনি অধ্যয়ন চিন্তা অতীব আনন্দের অবস্থা। দিবাকর এই নিভৃত রাজ্যে পূর্ব্বে কখন পদার্পণ করেন নাই। এত কাল যাবৎ তিনি কেবল আকৃতি বিস্তৃতি রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চতন্মাত্রের দেশে, ইন্দ্রিয়গ্রামে, দৃশ্যমান জগতে ইন্দ্রিয়াধিপতি মনের অধীনে জীবন কাটাইয়া আসিয়াছেন। আপনাকে আপনি স্বরূপতঃ জানিতেন না। পরমাত্মার সঙ্গে ত আলাপই ছিল না। নিভৃত নিস্পন্দ চিত্তগুহার অভ্যন্তরে এক্ষণে অনন্ত পরমাত্মার আভাস পাইলেন। তথায় গুরু নাই, গ্রন্থ নাই, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, যদিও নিরঞ্জনা শিয়রে বর্ত্তমান, কিন্তু তিনি তখন দিবাকরের অন্তঃকরণ হইতে বহু দূরে। তবে কে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবে? পথহীন এই প্রশান্ত মহাসাগরে কে পথ দেখাইবে? দিবাকর আপনি আপনার মধ্যে ক্রমাগত ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। যত ডোবেন, ততই দেখেন যেন কোন এক অতলস্পর্শ গভীর স্থান হইতে বিচিত্র চিন্তা এবং ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে। জলবুদ্বুদের ন্যায় আবার তাহা কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে। কোন কষ্ট নাই, ভয় নাই, কেবল অবতরণ। গভীর হইতে গভীর তলে নিমগ্ন। দেশ কালের অতীত সে মহাদেশ; তাহার কোন দিকে দিক্ নাই, সুতরাং বাধা প্রতিবন্ধক নাই। যত দূর ইচ্ছা চলিয়া যাও। জ্ঞান ইচ্ছা ভাব কোথাও বাধা কিম্বা বিশ্রামের স্থান পায় না।

নদীমূল-আবিষ্কর্ত্তা ভ্রমণকারীর ন্যায়, অন্ধকূপে মগ্ন ধাতুখননকারীর ন্যায় দিবাকর ক্রমে গভীর অভ্যন্তরে নামিতে লাগিলেন। "আমি কে? আমি কোথায়? চিন্তাস্রোত, ভাবের উচ্ছ্বাস কোথা হইতে আসিতেছে?

কে পাঠাইতেছে ?”এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে,অনুসন্ধান করিতে করিতে শেষে একবারে আত্মার মূল দেশে, গিয়া তিনি পৌঁছিলেন। সে স্থানে যাহা দেখিলেন, তাহা অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়। আরো নিস্তব্ধ গম্ভীর সে স্থান। অনন্তের বিস্তৃত বক্ষ হইতে জীবনের নদী বাহির হইয়া ভবারণ্য ভ্রমণপূর্ব্বক আবার এই খানে আসিয়া মিলিতেছে। তথায় শব্দতরঙ্গ কিছুই নাই, কিন্তু অতি আশ্চর্য্য, অতি অদ্ভুত। নিস্তব্ধ যামিনীর গর্ভস্থ ঘটিকাযন্ত্র যেমন নিদ্রিত নীরব বৃহৎ পুরীমধ্যে একাকী টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ শব্দ করে, তেমনি আত্মজ্ঞানের ভিতর হইতে পরমাত্মা পরম পুরুষ অলৌকিক স্বরে “আমি আছি” “আমি আছি” “আমি আছি” নিরন্তর এই বাণী ঘোষণা করিতেছেন। এই স্বর্গীয় অবিশ্রান্ত বাণী যখন দিবাকরের দিব্যকর্ণে প্রথমে প্রবিষ্ট হইল,তখন তিনি মহা হর্ষ এবং বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠিলেন,“অহো ! কি গূঢ় রহস্য ! কি অভাবনীয় ভগবৎ মহিমা ! আ ! কি আনন্দ ! কি বিশ্রাম আরাম ! এই তবে বিশ্বের মূল প্রস্রবণ, এবং আমার জন্মভূমি ? তাইত ! এই যে আমার ক্ষুদ্র আত্মজ্ঞান চৈতন্যের অন্তরালে অনন্ত জ্ঞানের মহাসমুদ্র দেখিতেছি ! ক্ষীণ দুর্ব্বল ইচ্ছাশক্তির মূলে এই যে দেখি বিশাল অনন্ত ইচ্ছাশক্তি। আহা, এই যে আমার হৃদয়ের ভাবতরঙ্গের মূলে মহাভাবের অতলস্পর্শ প্রেমপ্রস্রবণ। তাইত বলি, ক্রমাগত এত ভাব এত চিন্তা কল্পনা কোথা হইতে আসে ! আত্মন্ ! ইনিই তো তিনি যাঁর অসংখ্য নাম, অনন্ত গুণ, অশেষ কীর্ত্তি ? তবে এত দিনে চোর ধরা পড়িল। হরি হরি বল ! গুপ্ত রত্নভাণ্ডার অধিকার করিলাম। আর আমি এ স্থান ছাড়িব না। দেব, হে মহাদেব, তোমাকে প্রণাম করি ! তুমি কেমন, আমাকে একটু চিনাইয়া দাও।” এই বলিয়া ক্ষণকাল তিনি স্তব্ধীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। খানিক পরে চাহিয়া দেখেন যে আপনাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তখন ভাবে ভোর হইয়া বিস্ময়াবেশে ভাবিতে লাগিলেন, “ইনিই যদি তিনি, তবে আমি কে ? যাহা কিছু অনুভব করছি, সমস্তই ত অখণ্ড অনন্তের সত্তা। ইহা ত অদ্বৈতের রাজ্য অন্য দ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্ব কিছুত বোধ করিতে পারিতেছি না। ‘আমিটে” তবে ভূত না কি। কি বিপদ। সে পালালো কোথা ? ও। বটে। বটে। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লাম ! “তুমি তোমার নও, তুমি আমার !” এটা ঠাকুরের নিজেরই কথা। ঠিক্ ঠিক্ মিলে গেল।”

তদনন্তর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে দুঃখ এবং

আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমার এত দিনের সেই পুরাতন আমি কোথায় গেল। আদরের ধন, হে আমার আমি, তুমি কোথা? তুমি কি মরিয়াছ? একবারে পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছ? আহা, তুমি মনোবাজ্যে ইন্দ্রিয়গ্রামের রাজা হইয়া কত প্রভুত্ব করিতে। কত অহঙ্কার, কত ভাবনা কল্পনা, কত অভিলাষ। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এ সব ছেড়ে ছুড়ে তুমি কোথায় গেলে?"

শেষ মহাচীৎকার শব্দে নিদান ডাক ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে আমি, একটী বার ফিরিয়া চাও, দেখা দিয়া যাও। এস, জন্মের মত একবার কোলাকোলি করিয়া বিদায় লই।" ইহার উত্তরে কেবল গম্ভীর রবে "আমি আছি" এই মহানাদ উত্থিত হইল। পরে অনন্ত আকাশ কাঁপাইয়া গম্ গম্ শব্দে তাহার প্রতিধ্বনির তরঙ্গ উঠিল। তখন দিবাকর সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হইয়া তন্ময়ত্ব লাভ করিলেন। অনন্তের দুর্জ্জয় পেষণে তাঁহার ক্ষুদ্র আমিত্ব চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। চিদাভাস চিদাকাশে বিলীন হইল। তখন কেবল নির্ব্বাণ, মহানির্ব্বাণ।

পরে সেই সুগভীর প্রশান্ত সুনীল নির্ব্বাণ জলধিবক্ষ হইতে নিমেষের মধ্যে ভক্তিপদ্ম বিকসিত হইয়া উঠিল। অদ্বৈতের ভিতর দ্বৈত জ্ঞান আসিল, দ্বৈতাদ্বৈতে মিলন হইল। তখন তিনি নবভক্তিরসে মাতিয়া মৃদু মৃদু স্বরে, কখন বা ফিস্ ফিস্ শব্দে কথা কহিতে লাগিলেন। যেন খুব নিকটস্থ কোন ব্যক্তির সহিত কাণে কাণে কথা কহিতেছেন। তৎসঙ্গে মধ্যে মধ্যে হাসি, কান্না, কখন অভিমান আবদার। দিবাকর বলিতেছেন, "ঠাকুর, এত কাছে তুমি থাক, তবু ধরা দেও না কেন? আমার আমিত্বের গণ্ডগোলের মধ্যে এমনি লুকিয়ে ছিলে যে, যেন আমিই সব আর কেউ নাই। হায়! এখন দেখ্‌ছি, তুমিই ত সব। এত লীলা খেলাও ঠাকুর তুমি জান! আচ্ছা চতুর কিন্তু তুমি! বিদ্বানের চৌদ্দপুরুষেরও সাধ্য নাই যে খুঁজে বার করে। এখন আর কিছু চাই না, এইরূপ হাসি হাসি মুখে ঈশারায় আমার সঙ্গে নির্জ্জনে আলাপ কোরো! তোমায় কোটী কোটী প্রণাম।" নিরঞ্জনা এই সব অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পাপী যে নিমেষে স্বর্গে যাইতে পারে তাহা দেখিলেন।

অতঃপর দিবাকর সম্পূর্ণ চৈতন্য লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, চক্ষু মুছিলেন। আর কোন রোগ দুর্ব্বলতা নাই, যেন সহজ মানুষটী। "নিরঞ্জনাকে

সম্মুখে দেখিয়া আনন্দাশ্রুবিগলিত নেত্রে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। নবজীবনের নূতন চক্ষে নূতন পৃথিবী দেখিলেন।

ইতিপূর্ব্বে নারী জাতিকে দিবাকর এক দিকে ঘৃণা করিতেন, অপর দিকে সাময়িক কোন পার্থিব ভোগ্য বস্তুর ন্যায় জানিয়া তৎপ্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন; এক্ষণে স্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন, নিরঞ্জনার নির্ম্মল চরিত্রদর্পণে নিরঞ্জন পুরুষ প্রত্যক্ষ ভাবে বিরাজ করিতেছেন। এই দেবদৃষ্টি যখন প্রস্ফুটিত হইল, তখন তিনি শান্তিধামের সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিলেন। ভক্তবর বিশ্বম্ভরের ভক্তদলের মধ্যে এক জন উৎকৃষ্ট ভক্ত হইয়া রহিলেন। নারীমূর্ত্তি দর্শন, বিশেষতঃ নিরঞ্জনার দর্শন এক্ষণে তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মদর্শনের উত্তরসাধক।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিশ্বম্ভর, অমরনাথ, আরো কতিপয় সাধু যুবা কার্য্যালয়ে বসিয়া গত দিবসীয় দিবাকরের রূপান্তর প্রাপ্তির কথাপ্রসঙ্গে ভগবানের প্রত্যক্ষ কৃপাশক্তি আলোচনা করিতেছেন, তৎসঙ্গে ব্রাহ্মদিগের আবেদন পত্রের কথাও কহিতেছেন, এমন সময় সরলচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইল। তাহার ভাব উদাসীনের ন্যায়, চক্ষু দুটি ছল ছল, কেশ আলু থালু, পায়ে চটী জুতা, পরিধান থান ধুতি, গায়ে মোটা চাদর, মুখ খানি নিতান্ত বিমর্ষ।

পাপী অধম জীবের প্রতি ঈশ্বরের করুণার কথা শুনিয়া সরলের হৃদয় অতিবেগে উথলিয়া উঠিল। পিপাসা ব্যাকুলতায় প্রাণ অস্থির হইল। বিশ্বম্ভরের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আমাকে দুইটী ভাল কথা বলুন, শুনি।" এই বলিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার ক্ষিপ্তবৎ মূর্ত্তি এবং ক্রন্দনাকুলিত নয়ন দর্শনে উপস্থিত সকলেরই মনে হরিলীলার এক তরঙ্গ উঠিল। সরলচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের একটী সভ্য, কোন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব, বিশ্বম্ভর তাহাকে কোলে জড়াইয়া সান্ত্বনা দিলেন।

হৃদয়াবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে সরলচন্দ্র স্বীয় জীবনকাহিনীর গূঢ় কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমার অন্তঃকরণ যেন শুষ্ক

মরুভূমিবৎ হইয়া উঠিয়াছে। এত দিন পরিবারে, সমাজে, ও গ্রামোদে ধর্ম্মকর্ম্মে, জ্ঞানচর্চ্চায় কাটাইলাম, এখন ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখি, সবই ফাঁকি। আত্মদৃষ্টির সম্মুখে ধরিবার ছুঁইবার কিছু পাই না। জ্ঞানের পথে, যোগের পথে গেলে কেবল অনন্ত নির্ব্বিশেষ নিরাকার অদ্বৈত দেখি, ভক্তি সাধন করিতে গেলে জড়মূর্ত্তি সামনে আসিয়া দাঁড়ায়।"

বি। যোগভক্তির সামঞ্জস্য সাধন করিয়া সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে ধর। তিনি নিরাকার হইলেও ইচ্ছাময় দিব্যপুরুষ, পিতা মাতা সখার ন্যায় হৃদয়স্পর্শী। ইচ্ছাই তাঁহার রূপ, অনন্ত নিগূঢ় অভিপ্রায়ে তিনি পরিপূর্ণ।

স। সেত ঠিক কথা, কিন্তু আমি যে আত্মপ্রবঞ্চিত অপদার্থ জীব।

বি। মনে কিরূপ বোধ হয় ?

স। বোধ হয় যেন আপনাকে আপনি ঠকাইতেছি। যা বুঝিতে পারি না, তাই অন্যকে বুঝাইতে যাই, যাহা দেখি নাই, অনুভব করি নাই, তাহার ভাণ করি। কোন একটা সত্যের গোড়ায় বিশ্বাসের বল অনুভব করিতে পারি না। অথচ অনেক উচ্চ মত প্রচার করি। লোকঠকানত যথেষ্টই হয়, তদ্ব্যতীত ভগবানকেও উপহাসের বিষয় করিয়া ফেলিয়াছি।

বি। কত দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেছ ?

স। তা অনেক দিন হবে, বিশ বৎসরের কম নয়; কিন্তু কেহ যদি চেপে ধরে ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মশ্রবণ হয়েছে কি না? স্পষ্ট উত্তর দিতে পারি না।

বি। কেন! হইাত অস্পষ্ট অনুমানের বিষয় নয়।

স। নৈলে আর দুর্গতির কথা বলছি কেন। জীবন যেন শূন্য বলিয়া বোধ হয়।

বি। উপাসনা কি সজনে, না নির্জ্জনে কর ?

স। সজনেই অনেক সময়। এবং তাহাতেই অরুচি জন্মে গেছে। বরং নির্জ্জন উপাসনায় একটু আরাম বোধ হয়।

বি। আরামের কর্ম্ম নয়। চরিত্র না গড়িলে, জীবন ঈশ্বরেচ্ছার অধীন না হইলে সব বৃথা। যাঁদের সঙ্গে উপাসনা কর, তাঁহাদের সহিত আত্মায় আত্মায় হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ হয়ত ?

স। তা যদি হবে তবে আর ভাবনা কি ? কেবল এক জায়গায় শরীর গুল যড় হয়, আত্মা আপনার আপনার কাছে স্থিতি করে।

বি। ইহাকে বলে উপাসনার প্রদর্শন, বাস্তবিক ইহা সজন বা সামাজিক উপাসনা নয়। যথার্থ আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃভাব ব্যতীত সজন উপাসনা অসম্ভব। আচ্ছা এত দিন যে ব্রাহ্মসমাজে আছ, ব্যথার ব্যথী, জীবনবন্ধু কি কাহাকেও পাও নাই?

স। একটীও না, হৃদয় খালি পড়ে রয়েছে; কেউ কারো নয়, সব যেখানে সেখানে কোলাকোলি। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে যথার্থ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মবন্ধুতার কোন নিদর্শন কোন কালে দেখি নাই। এমন কি, যে সময় আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ পৃথিবীতে ছিলেন, বিশেষতঃ তাহার অব্যবহিত পরে এ বিষয়ের বড়ই অভাব ছিল। এখনকারত কথাই নাই। সেই জন্যই আপনাদের আমরা চাহিতেছি।

অমর। সেই অভাব পূরণের জন্যইত বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের আবির্ভাব। ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনায় বলিয়াছিলেন, "পিতার সঙ্গে যোগ হইল, ভ্রাতার সঙ্গে হইল না।"

সবল এই কথা শুনিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! পৃথিবীতে যথার্থ আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃভাব কি সম্ভব?"

বি। সম্ভব না হইলে হল কেন?

স। তাইত, আহা! আপনারা এই কঠিন সমস্যা কিরূপে পূরণ করিলেন? সকলেইত আপনারা পূরো স্বাধীন, অথচ পরস্পরের এত অধীন কিরূপে হইলেন?

বি। ভালবাসায় উচ্চ নীচ সমান হয়। ভগবান ভালবাসিতে শিখিয়েছেন। আমাদের ব্যবহার বিচিত্র, কিন্তু সব বিষয়ে এক ভালবাসার স্রোত বহিতেছে।

সবল এই দলে মিশিবার জন্য আত্মসমর্পণ করিলেন। বলিলেন, "আমার প্রাণে যাতে শান্তি হয় তাই করে দিন।"

বি। প্রার্থনা কর তো?

স। প্রকৃতরূপে তা হয় কৈ? ধর্ম্মের যে সকল কথা বলি, সে সমস্ত আলোচনা করিয়া শেষ আপনাপনি মনে হয়, সাধু ভক্তেরা যেন হাসিয়া বলিতেছেন, "তুই কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্? ঠাকুরকে অত করে বুঝাতে হবে না, আপনি আগে বোঝ্। এ কি লৌকিক কুটুম্বিতা।"

বি। যা বল, তা কি ঠিক অভাবানুযায়ী অবস্থা অনুভব করিয়া বল না?

স। তা কৈ পাবি? এই আশায় করি, যে বলতে বলতে তদনুরূপ ভাব হৃদযঙ্গম হইবে।

বি। তা কি হয না?

স। হয় এক রকম, কিন্তু সেটা বাহিরের ভাব। ভিতর হইতে প্রস্রবণ উন্মুক্ত হয না। সাধু ভক্তদের তিরস্কার ভৎসনায় আমি কথা কহা বন্ধ করিছি। দুঃখ অনুতাপ বিলাপেও আর সাহস হয না। কে যেন মুখ চাপিয়া ধরে।

বিশ্বম্ভর মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "তুমি যা যা বুঝেছ, সবই ঠিক। ঠাকুর বড় চতুর। তাঁর ভক্তেরাও ভারি বুদ্ধিমান। সেখানে পদে পদে অপদস্থ হইতে হয, ভাবের ঘরে চুরি চলে না।"

স। সেই জন্যইত আমি এখন হাত পা গুটিযে, মুখ লুকিযে, মৌনী হযে ভিতরে কি আছে না আছে তাই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হযেছি।

বি। বেশী বাড়াবাড়ি আবার ভাল নয। শেষ শুচি বাইগ্রস্ত রোগীর ন্যায মন সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ হইযা পড়িবে। কড়ায় গণ্ডায মিলাইতে চেষ্টা না করিযা ভাবের স্রোতে অঙ্গ ঢালিযা দাও।

এই কথাটি যাই তিনি বলিযাছেন, অমনি বিদ্যুতের মত চড়াৎ করিযা সকলের সরল হৃদযে তাহা লাগিযা গেল। ভক্তিপ্রস্রবণ হইতে অবিরল ধারে ভাবস্রোত উৎসারিত হইতে লাগিল; অঙ্গ শিহরিল, অন্তঃকরণ ভাসিল, নয়নে প্রেমধারা ছুটিল, পরিশেষে জীবনের নদী অনন্ত প্রেমসিন্ধুর পানে মহাবেগে ধাবিত হইল। তাহার তরঙ্গ লহরীর উপর ভগবৎকৃপা-সমীরণ মৃদু মন্দ গতিতে হিল্লোলিত হইতে লাগিল।

তখন বিশ্বম্ভর প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। সে প্রার্থনা যেন ঠিক প্রাণ-সখার সঙ্গে গল্প করা। আহা! ভাব আর ধরে না। কয়টী আত্মা ভাব-স্রোতে একাকার হইযা চিদানন্দের অনন্ত বক্ষে খেলা করিতে লাগিল। বিগলিত হৃদযে হৃদযনাথ তখন গীত গাইলেন,—"চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী। মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।" ইত্যাদি।

সঙ্গীত শেষ হইলে ভাবে ভোর হইয়া প্রেমরাগরঞ্জিত লোহিত লোচন উন্মীলনপূর্ব্বক সম্মুখে সকলে হঠাৎ চাহিযা দেখেন যে এক মহিমাশালিনী সন্ন্যাসবেশধারিণী অপূর্ব্ব নারী মূর্ত্তি। কখন তিনি তথায় আসিয়াছেন কেহ জানে না। সন্ন্যাসিনী হাস্যমুখে মৃদু মধুর স্বরে গীত গাহিয়া গাহিয়া ঈষৎ

অঙ্গ সঞ্চালনের সহিত নাচিতেছিলেন। সহসা সে রূপ দর্শনে ভক্তবৃন্দের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, হৃদয়সিন্ধু মহাবেগে উথলিয়া উঠিল। সন্ন্যাসিনীর অঙ্গকান্তি যেন শরতের শ্বেত মেঘাবৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায়; কুসুমদলখচিত কেশ-রাশি আলুলায়িত হইয়া পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে; হস্তে বীণা, দুই কানে দুইটী গোলাপ ফুল, গলায় এক গাছি ফুলের মালা, আপাদগ্রীবা ভগবান বস্ত্রে আবৃত। তাঁহার প্রেমবিহ্বলা নৃত্যময়ী মনোহারিণী মূর্ত্তি এবং সুললিত সঙ্গীত কঠোর চিত্তকেও উন্মাদ করিয়া তোলে। ভক্তগণ তাঁহার চরণে লুটাইয়া প্রণাম করিলেন এবং একাগ্র দৃষ্টে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন সেই প্রেমোন্মাদিনী দেবী সেই মৃদু কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্রমে পঞ্চমে সপ্তমে তুলিয়া বীণার ঝঙ্কারের সহিত এমনি হরিগুণ গাইলেন, এবং সেই সঙ্গে এমনি নাচিতে লাগিলেন, যে তাহা দেখিয়া শুনিয়া সকলের প্রাণ মাতিয়া উঠিল। ইঁহার নাম ক্ষেপামায়ী। ক্ষণকাল পরে ক্ষেপামায়ীকে তাঁহারা পরম সমাদরে শান্তিধামের মহিলাগণসমীপে লইয়া গেলেন। ক্ষেপামায়ীর কাজের মধ্যে কেবল দিবা নিশি যেখানে সেখানে, যখন তখন নৃত্য গীত আর হাস্য। তাঁহার আগমনে শান্তিধাম মহোল্লাসে মত্ত হইল। ক্ষেপা মা নরনারী বালক বালিকা সকলকে একেবারে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শান্তিধামে হৃদয়নাথের প্রকোষ্ঠে বৈকালে বসিয়া পুরনারীগণ নানাবিধ সৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। কেহ কোন সৎগ্রন্থ পড়িতেন, অবশিষ্ট সকলে সাধারণ দয়ার সাহায্যার্থ শিল্প কার্য্যবিশেষে ব্রতী হইয়া উহা শুনিতেন এবং তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেন। মধ্যে মধ্যে ক্ষেপা মায়ের কৃত "দে মা পাগল করে" এবং অন্যান্য গীত গাইতেন। হৃদয়ের অনেক গুলি সন্তান, তাঁহার স্ত্রী অনুসূয়া দেবীকে এই জন্য অনেক সময় বিব্রত থাকিতে হয়। একটী ছেলের আজ জ্বর হইয়াছে, সে জননীকে ছাড়িতে চায় না, তন্নিমিত্ত তাঁহার মুখ খানি কাঁদ কাঁদ। চুলবাঁধা, গা ধোয়া কিছুই হয় নাই। তদবস্থায় মহিলাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, বসুন্ধরা বলিলেন,

"দিদি, তুমি একটু এখানে বসিয়া বিশ্রাম কর, আমি খোকার কাছে গিয়া বসি।" সুরতরঙ্গিণী বলিলেন, "ভয় কি। ব্যামো হ'য়েছে সেরে যাবে, সে জন্য তুমি অত ভাবছ কেন?' অনুসূয়া বলিলেন, "সে ভাবনা আমি তত ভাবছি না, অতিথিশালার খাবার সামগ্রী এখনো ভাণ্ডার হইতে বাহির করা হয় নাই, তরকারি কোটা হয় নাই।" অমরনাথের স্ত্রী তরঙ্গিণী এবং বিশ্বম্ভরের বিধবা ভগ্নী মমতা দেবী বলিলেন, "এই জন্য তুমি মুখ বিষন্ন করে বসে আছ? তা এত ক্ষণ বল্‌তে হয় আচ্ছা, তুমি এখানে বসিয়া একটু ঠাণ্ডা হও, আমরা ভাণ্ডারে যাই।" এই বলিয়া তাঁহারা দুই জনে আস্তে ব্যস্তে সেইদিকে চলিলেন। তাহাদের পাছে পাছে অনুসূয়াও ছুটিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "বটে! তাই দিচ্চি। আমার কাজটী। ওঁরা মজা করে করবেন। তা হবে না। তোমরা যা করছিলে তাই করগে, আমি সে সব করব।" ইনি বলেন আমি করিব, ওঁরাও বলেন আমাদিগকে করিতে দেও। এই বলিয়া তিন জনে হাত কাড়াকাড়ি। মমতা দেবী অনুসূয়ার গলা জড়াইয়া তাঁহার চিবুক চুম্বন করিয়া আদরপূর্ব্বক বলিলেন, "ভগ্নী, তুমি অনেক খেটেছ, একটু ঠাণ্ডা হওগে, তোমার হয়ে আজ আমরাই অতিথিসেবার কার্য্যটা করি। মনে কর, এ যেন তুমিই করিতেছ।"

যে সকল মহিলা শিল্পকার্য্যে এবং গ্রন্থপাঠে নিযুক্ত ছিলেন, অনুসূয়া তথায় গিয়া বসিলেন। বিশ্বম্ভরের দ্বিতীয়া সহোদরা উর্ম্মিলা ঘোড়া হইতে নামিয়া চাবুক হাতে তথায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাহাকে দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইলেন এবং এক খান চেয়ার আনিয়া বসিতে দিলেন। উর্ম্মিলার মূর্ত্তি খানি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো কৃশ হইয়াছে, মুখ পিঙ্গলবর্ণ, বিবিধ পোষাক পরা দেহটী যেন খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় উড্ডয়নশীল।

উ। থাক থাক নীচেই বসিতেছি, চেয়ারে দরকার নাই।

অনু। তাতে আর ক্ষতি কি, নীচে বসিতে কষ্ট হবে।

উর্ম্মিলা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া তথায় বসিলেন এবং অনুসূয়ার প্রতি চাহিয়া হঠাৎ যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন: "এ কি! তুমি এত কাহিল কেন। অনুসূয়া নয়? তাইত, সেইত বটে। কি আশ্চর্য্য, চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে? আমি যেন চিনিতে পারিতেছি না। কিছু ব্যারাম ট্যারাম হয়েছে না কি?"

অনসূয়া। (প্রফুল্ল মুখে) না, না, ব্যারাম কিছুই নয়। তুমি খুব ভালবাস, তাই কাহিল দেখছ।

উ। বল কি। ব্যারাম নয়ত কি? কলেজে যখন দুই জনে এক ক্লাসে আমরা পড়তাম, তখন যে তোমার চেহারা অতিশয় ভাল ছিল।

অপর মহিলারা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অনেক খাটতে হয়, ভাবনা চিন্তায় শরীর শ্রীহীন হয়েছে।" বন্ধুরা তামাসাচ্ছলে বলিলেন, "সংসারে বৈরাগ্য জন্মেছে, তাই রোগা দেখাচ্ছে।"

অনসূয়া। দিদি, কালেজে দেখেছিলে, সে এক দিন। এখন সন্তান-পালন, স্বামীসেবা, গৃহাশ্রমের এবং শান্তিধামের পরিচর্য্যার ভার মাথায়, শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিবার সময় পেয়ে উঠি না।

উ। ছেলে মেয়ে কয়টী?

তরঙ্গিণী। তা ষষ্ঠির মুখে ছাই দিয়ে অনেকগুলি। গুটি আট নয়।

উ। ও! সেই জন্য! তাইত, বড় দুঃখিত হলেম। আছ কেমন? মনে বেশ সুখ পাওত?

অন। (হাসিতে হাসিতে) বেশ আছি। এটাও এক প্রকার কলেজ। বরং তদপেক্ষা বেশী। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী বড় কঠিন। পদে পদে বেত খেতে হয়।

উ। সময়ই পাও না, তবে বিদ্যা শিখবে কিরূপে? এখন কিছু পড়া শুনা কর কি? না সব ভুলে গেছ? এ দেশের মেয়েরা গিন্নী বান্নী হইলে আর পড়া শুনা গীত বাদ্যের কোন চর্চ্চা রাখে না।

অন। এখন আমি অন্য রকম গ্রন্থ পড়ি।

উ। কি গ্রন্থ?

অন। ছেলে পড়ি, মেয়ে পড়ি, স্বামী পড়ি, ঝি চাকর পড়ি, বাজারের আলু পটোল পড়ি, ভগ্নীসেবা ভ্রাতৃসেবা পড়ি; সন্তানদিগের ব্যারাম, ঝি চাকরের জুয়াচুরি, অতিথির রাগ, ছেলেদের আবদার কান্না, এই সব পাঠ্য। ইহা ব্যতীত চাল ডালের ভাণ্ডার, ঘটী বাটী বিছানা কাপড়, বিপদ রোগ শোক নিন্দা অপমান, গ্রন্থের আর এখন অন্ত নাই।

উ। সেই জন্য তোমার এই দশা হয়েছে! এত লেখা পড়া শিখে শেষ এই! হা কপাল!

পূর্ব্বে অনসূয়া এবং উর্ম্মিলা এক সঙ্গে কলেজে পড়িতেন, দুই জনে

বড় বন্ধুতা ছিল, উভয়েই বি, এ, পর্য্যন্ত একত্রে পড়েন; পরে উর্ম্মিলা এম, এ, পাস দেন, অনসূয়া বিবাহিত হইয়া গৃহধর্ম্মে মন দিয়াছেন। তাঁহাকে বহুসন্তানবতী এবং গৃহকার্য্যে ভারাক্রান্ত দেখিয়া উর্ম্মিলার অন্তঃকরণ বড়ই ব্যথিত হইল।

অন। দিদি, তুমি আমাকে রোগা বলছিলে, তোমারোত ক্রমে সূক্ষ্মদেহ হয়ে আস্‌ছে। আছ কেমন?

উ। শরীরটে তত ভাল নয়। একটু বাতের মত হয়েছে, তাই ডাক্তারের পরামর্শে ঘোড়ায় চড়িতে আরম্ভ করিছি।

অন। মাথা কেমন?

উ। মাথাও ভাল নয়। প্রায়ই শিরঃপীড়া হয়। নিদ্রা বড় কম। এই জন্য পাহাড়েই প্রায় এখন থাকি।

অন। কেবল লেখা আর পড়া, মাথার আর অপরাধ কি?

বসুন্ধরা। ঠাকুরঝি, তোমার বর আস্‌বে কবে?

তরঙ্গিনী "দূর কালিন্দী" বলিয় তাঁহার গায়ে একটা ধাক্কা দিলেন। অপর সকলে হাসিতে লাগিলেন।

উ। আমার বর তোমরাই।

ব। এ যুগে কি মেয়েতে মেয়েতে বিবাহ হবে?

উ। পণ্ডিত আগষ্ট কোমৎ তাও বলেছেন। বিজ্ঞানবলে কিছুই অসম্ভব নয়।

তর। যেরূপ মেয়ের সংখ্যা বাড়ছে, এ প্রথা চলিত হইলে মন্দ হয় না।

অন। বিজ্ঞানবলে কি স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি পর্য্যন্ত বদলে যাবে?

উ। সময়ে সকলি সম্ভব। হনুমান হইতে মানুষ হইল কিরূপে? আমি হিউম্যানিটিকে বিবাহ করিছি। বুঝলে বড় বউ?

অন। আচ্ছা তা কোরো, এখন তুমি সুখে আছ কি না বলতে হবে। আমি কিন্তু সুখে আছি। যদিও ভাবনা চিন্তা ক্লেশ পরীক্ষা অনেক। আর বিদ্যাও ক্রমে বাড়িতেছে, শেষ হয়নি।

উ। আমিও বেশ স্বাধীন ভাবে আছি, কোন নেঞ্জার নাই, ছেলে মানুষ করার দায় এড়িয়েছি। তোমাদের বাপু বড় কষ্ট।

ত। জলের মাছ শুকনা ডাঙ্গায় কত ক্ষণ বাঁচে?

উর্ম্মিলার অস্থিময় মুখ, কোটরে প্রবিষ্ট চক্ষু, কৃশ শরীর স্পষ্ট ভাষায়

বলিতেছিল, মনে সুখ নাই। হৃদয় শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায়, বুদ্ধি বদ্ধ জলের ন্যায় স্রোতবিহীন।

উর্ম্মিলা দেবী এ কথার আর উত্তর না দিয়া বলিলেন, "শুনছি না কি নলিনীকান্ত বাবু বড় দাদার কাছে আসা যাওয়া কচ্ছেন? নিরঞ্জনাকে পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য তিনি না কি এখন বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন?

বসু। সত্যি! ওমা, এ কথা তুমি কোথায় শুনলে! আহা তা বেশ বেশ! বড় ভাল কথা।

তব। হাঁ, মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে পাই বটে।

বসু। আমি তা হলে আমার ঘর তাঁকে ছেড়ে দেব। আহা নিরঞ্জনার মত মেয়ে মানুষ আর আমি দেখিনি। তাঁর মুখ খানি দেখ্‌লে প্রাণটা যেন কেমন করে। ইচ্ছা হয় গলাটা জড়িয়ে ধরে কাঁদি। মুখের হাসি টুকু আহা যেন বিষাদমাখা।

অন। হাসি আবার বিষাদমাখা! বড় বউ আমাদের যেন কি! স্ত্রী-লোক যখন হাসিবে, সে হাসির ভিতর আহ্লাদের ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হয়ে পড়বে, তবেত বলি হাসি!

মমতা। বিষাদমাখা হাসি আছে বৈ কি।

উ। হাসি নানা রকমের আছে। মনে আহ্লাদ নাই, কেবল ঠোঁট দুইটী একটু শব্দের সহিত হাসে। কেহ ঠাট্টার ভাবে হাসে। কেহ রাগ বিদ্বেষের সহিত বাঁকা মুখে দাঁত বার করে দুষ্ট হাসি হাসে। বিচিত্র স্বরে নানা রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া বৈরনির্য্যাতনের জন্য কেহ হাসে। সভ্য জাতির মধ্যে "আই অ্যাম ভেরি গ্ল্যাড" বলিয়া তার সঙ্গে দুই একটী দাঁত বাহির করিয়া হাসিত কথায় কথায়। আবার আকর্ণবিস্তৃত বত্রিশ দন্তবিকসিত হাসিও আছে।

বসু। মৃদু হাসির কথা বল্‌লে না?

অনু। এ সকল সভ্যতার হাসিকে আমি হাসি বলি না। যে হাসিতে হৃদয় উদ্ঘাটিত না হয়, মধুর নিনাদ না উঠে, যাহাতে মুক্তামালার ন্যায় দন্তপাঁতি ওষ্ঠাধরের সহিত প্রেমজ্যোতি বিকাশ না করে, চক্ষে ললাটে গণ্ডস্থলে মাধুর্য্যরস উছলিয়া না পড়ে, তাহা অপূর্ণ অথবা বিকৃত হাসি। হাসির জ্যোৎস্নায় সমস্ত অঙ্গ বিভাসিত হইবে। কি বল বড় বউ?

উর্ম্মিলা দাঁড়াইয়া বলিলেন, "সে যা হউক, এখন তোমরা নিরঞ্জনার জন্য

পুনরায় বাসর ঘর সাজাও এবং প্রাণ ভরিয়া হাস এবং হাসাও। তোমাদের আর কিছু লাইক্‌ করি না করি, হাসিটে খুব ভাল। গুড্‌বাই! চল্‌লুম।”

উর্ম্মিলা চলিয়া গেলে বসুন্ধরা বলিলেন, “দীনেশ বাবুর সঙ্গে বট_ ঠাকুঝির বিয়ে হলে বেশ মানায়।

অমু। হাঁ, ইনিও যেমন পুরুষবিদ্বেষী, তিনিও তেমনি বিরক্ত বৈরাগী স্ত্রীবিদ্বেষী।

ভব। বড় ঠাকুরঝি আর বিয়ে কংরেছে! এ দিকে যে হাড় সার হয়ে এল।

অন। বিয়ে হলে আবার গজাবে। উর্ম্মিলা মেম হোক আর বিবাহ না করুক, মনটী বড় ভাল। কখন কারো মনে ঠোকর দিয়ে কথা কয় না। ছেলেবেলা থেকে আমি ভাই ওকে বড ভাল বাসি।

কথায় কথায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সকলে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। বসুন্ধরা মনে মনে দীনেশের সঙ্গে উর্ম্মিলার বিবাহের ঘটকালী আরম্ভ করিলেন। কেবল ঘটকালী করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। কল্পনার সাহায্যে বিবাহ দিয়া, ঘরকন্না সাজাইয়া, উদাসীন দীনেশকে গৃহস্থ করিয়া তবে ছাড়িলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মসমাজের দলাদলি মিটাইবার জন্য যাঁহারা ইতঃ পূর্ব্বে সম্মিলন সভা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিছু দিন দুই পাঁচটা সভা এবং বক্তৃতা করিয়া শেষ পরলোকে চলিয়া যান। আন্তরিক মিলনের কার্য্য তাহাদিগের দ্বারা বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই। যাঁহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গণ্ডিমধ্যে বসিয়া দলাদলির সৃষ্টি করেন, গোপনে গোপনে দল বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সাম্প্রদায়িক ঘৃণা বিদ্বেষ চরিতার্থ করেন, তাঁহারাই আবার সম্মিলন সভার সাধারণ ভূমিতে দাঁড়াইয়া বলেন, “মূলে আমরা সব এক। এক

ঈশ্বর পিতা, নর নারী ভ্রাতা ভগিনী।" সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা দলাদলি মিটিবে কিরূপে? শাখায় শাখায় যদি কাটাকাটি সংঘর্ষণ এত বেশী থাকে, মূলের অতি সূক্ষ্ম একতায় কি হইবে? পৃথিবীর চারি খণ্ডের লোকে গোড়ায় এক ঈশ্বর মানে, কিন্তু তাহাতে কুলায় না। এই জন্য বহু দিন পর্য্যন্ত এ সভা কেবল নামমাত্র ছিল। সভা ভাঙ্গিবামাত্র, যাহাদের বাড়াতে সভা হইত তাহারা হাসিত আর বলিত, "কেবল বচন আর সন্দেশের শ্রাদ্ধ।"

যাই হউক, সৎকার্য্যের সকলই ভাল। প্রথম উদ্‌যোগকারীদিগের পর যাঁহারা ইহাতে যোগ দিলেন তাঁহারা অপেক্ষাকৃত উদার ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ঘৃণা বিদ্বেষ স্থান পাইত না। তার পরে যাঁহারা আসিলেন তাঁহাদের দ্বারা দলাদলির প্রাচীর প্রায় ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল।

মহামিলনকারী উদারাত্মা বিশ্বম্ভর এই সভায় প্রথমে সাদরে আহুত হন এবং তিনিই ইহাতে নবজীবন সঞ্চার করেন। তাহার দৃষ্টান্তে এবং আগ্রহ যত্নে এই সভা দিন দিন মহা প্রভাবশালী হইয়া উঠিল। বিশ্বম্ভর ইহা দ্বারা সমস্ত ব্রাহ্মমণ্ডলীমধ্যে প্রেমের জীবন্ত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত ছিলেন না, এমন সকল উদার ধার্ম্মিক হিন্দু খ্রিষ্টীয়ান মুসলমান পর্য্যন্ত ইহাতে যোগ দিলেন। তাহারা যখন আসিয়া যোগ দিলেন, তখন যে দুই পাঁচ জন দলাদলিপ্রিয় অহঙ্কারী সঙ্কীর্ণহৃদয় ব্রাহ্ম ছিলেন, তাঁহা-দিগকে মুখ লুকাইতে হইল। বিশ্বম্ভরের মহচ্চরিত্রের তেজের সম্মুখে, তদীয় দুর্জ্জয় প্রেম ভক্তির স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয় এমন কেহ নাই।

তাঁহারই যত্নে শেষ এই মিলনসভার একটী বাৎসরিক উৎসব হয়। তদুপলক্ষে ভারতক্ষেত্রে এক আশ্চর্য্য জাতীয়ধর্ম্মস্রোত উন্মুক্ত হইয়া যায়।

১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে জাতীয় মহাসমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বোম্বাই মাদ্রাজ পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতে বহু লোক এখানে আসিয়াছিলেন। উৎসবান্তে ধর্ম্মসংক্রান্ত মহামিলন সভার এক অধিবেশন হয়। সমবেত মণ্ডলীর সেই দৃশ্য যাঁহারা দেখিলেন তাহারা আর স্বার্থপর সঙ্কীর্ণমনা হইয়া থাকিতে পারিলেন না। মানুষ ভাঙ্গে, ভগবান্ গড়েন। ভগবানের গঠন কি মনোহর। এই প্রেমমিলনে লীলাময় হরির মহামিলনলীলা আরম্ভ হইল। তিনি প্রেমরূপে নর নারীর হৃদয়ে হৃদয়ে অবতরণ করিলেন।

মাঘ মাসের শেষে, শীত বসন্তের মধ্য সময়ে, গড়ের ময়দানে প্রকাণ্ড এক

সামিয়ানার তলে মহামিলনের সভা। যেমন মহতী সভা, স্থানও তাহার উপযুক্ত, স্বয়ং ভগবান্ যেন কারীগর বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা এই সভা রচনা করিলেন।

লাল বনাতমোড়া দিব্য এক কাঠের গ্যালারি। দশ সহস্র লোক বসিবার উপযুক্ত আসন তাহাতে প্রস্তুত হইল। পুষ্পমালা, জীবন্ত তরুগুল্ম, সজীব সরস বৃক্ষপত্রাবলীতে সভামণ্ডপ সুসজ্জিত। প্রত্যেক শ্রেণীতে সারবন্দী এক এক রঙ্গের ছোট ছোট নিশান। তাহাতে সত্য জ্ঞান প্রেম পুণ্য শান্তি একতা মিলন ইত্যাদি শব্দ সকল অঙ্কিত। প্রত্যেক নিশানের গোড়ায় এক একটী কুসুমের স্তবক। গ্যালারির মধ্যস্থলে আচার্য্যের বসিবার স্থান। তাঁহার মস্তকের উপরি ভাগে বিচিত্র বর্ণের এক কুসুমময় চন্দ্রাতপ। একদিকে ক্ষুদ্র বালক বালিকা, একদিকে কেবল মহিলাগণ, অপরদিকে বাঙ্গালী পুরুষ, অন্য এক দিকে বৈদেশিকদিগের আসন। নানাবিধ বসন ভূষণে সজ্জিত বালক বালিকা যুবক যুবতী নরনারী কৌতূহল নেত্রে, প্রফুল্ল চিত্তে, অনুরাগ-রঞ্জিত আননে আচার্য্যের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। মহা আনন্দের মেলা, অথচ তাহাতে শান্তির গাম্ভীর্য্য। ক্ষণকাল পরে মৃদঙ্গ মন্দিরা এক-তারা বেহালা এসরাজ হারমনিয়াম সেতার তানপূরার মধুর গম্ভীর ঝঙ্কারের সহিত যখন ভগবানের স্তুতিগীত সমুত্থিত হইল, তখন সকলের হৃদয় মন প্রাণ তাহার সঙ্গে মিশিয়া মর্ত্যধাম ছাড়িয়া স্বর্গের দিকে উঠিতে লাগিল। প্রথমে এই সঙ্গীতটী হয়।—

"কর হে আনন্দে জয় গান। হয়ে এক প্রাণ।
আমরা সকলে সেই এক পিতার সন্তান।
এক জ্ঞান এক শক্তি, এক ধর্ম্ম এক ভক্তি,
এক পথ এক গতি, এক গম্য স্থান,
তবে কেন ভেদবুদ্ধি, কেন বৃথা অভিমান ?
গৃহবিবাদ অনলে, রাগ দ্বেষহলাহলে,
জ্বলে প্রাণ, শান্তিজলে কর হে নির্ব্বাণ ;
সহে না সহে না আর লোকনিন্দা অপমান।
যে দেশ হইতে সবে, এসেছি ভাই এই ভবে,
সেখানে যাইতে হবে, বিধির বিধান ;
তিনি বিনা কারো কাছে নাহি আর পরিত্রাণ।

হরিপ্রেমরসে গলে প্রেমধামে যাই চলে,
ভাই বলে করি সবে আলিঙ্গন দান;
যেখানে ভকতবৃন্দ, সেইখানে ভগবান।
জয় দেব প্রেমময়, হইল প্রেমের জয়,
তব নামে নাহি রয় ভেদ ব্যবধান;
প্রেমদাস ও চরণে অন্তে যেন পায় স্থান।

বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের মিলন যেমন মনোহর, বিচিত্র স্বভাব মানবের উদ্দেশ্য ও সদ্ভাবের মিলন তদপেক্ষা আরো মনোহর। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন সঙ্গীতের আনন্দহিল্লোল শ্রোতৃমণ্ডলীর আত্মাকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বামীর মহাসিংহাসনের সমীপবর্ত্তী করিতেছে। চেষ্টা করিয়া কাহাকেও আর ভগবৎসন্নিধানে যাইতে হইল না, ভগবানের সঙ্গীত দেবদূত স্বরূপ হইয়া সকলকে আকাশে উড়াইয়া লইয়া গেল। বহু বৎসরের তর্ক যুক্তি সভা সমিতি নিয়ম বিধি শাস্ত্রবচন দ্বারা যে মিলন সম্পাদন অসম্ভব হইয়াছিল, তাহা ভগবানের ইঙ্গিত মাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে নিষ্পন্ন হইল।

অতঃপর আচার্য্য বিশ্বম্ভর মহাভাবে বিগলিত হইয়া প্রাচীন ঋষিবাক্য "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" এই মন্ত্র যখন সমবেত মণ্ডলীর সহিত গান করিতে লাগিলেন, তখন গভীর গর্জ্জনে আকাশ অবনী কম্পিত হইয়া উঠিল। পরে দেবশক্তির প্রেরণায় একটী সুমিষ্ট প্রার্থনা করিয়া তিনি বলিলেন, "হে ভারতের একেশ্বরবাদী আর্য্যসন্তানগণ। হে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ! অদ্যকার এই মিলন কি তোমাদের আশার অনুরূপ নহে? (শ্রোতৃবর্গের মৃদু হাস্য) পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে বিধাতার লীলাবিধান কি এই জন্যই এ দেশে অবতীর্ণ হয় নাই? গত শতাব্দীতে যাহা বীজরূপে ভারতক্ষেত্রে রোপিত হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে ফুল ফলে শোভিত হইল। যথাকালে সত্যের বীজ এইরূপে অঙ্কুরিত হয়, তাহার ধ্বংস নাই। হে বিভক্ত দলত্রয়ের ব্রাহ্ম-বন্ধুগণ, অনর্থক গোটা কতক মতভেদের নাম লইয়া তোমরা ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলে।

"আদিব্রাহ্ম, তুমি দেশীয় পুরাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রতি অযথা পক্ষপাতী হইয়া উদার সার্ব্বভৌমিক যুগধর্ম্ম এবং ভক্তিবিধানের স্বর্গীয় মাহাত্ম্য বুঝিতে পার নাই, তাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নামেও সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করিয়াছিলে; এক্ষণে তোমরা উদার হও এবং ভক্ত হও। ঔপনিষদিক্ ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মারাধনার

যে মধুর গম্ভীর ভাব তোমরা পুনরুদ্ধার করিয়াছ তজ্জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আরো অগ্রসর হইতে হইবে।

"হে ব্রাহ্ম সাধারণ, তোমরা ভক্তিবিধান ও ভক্তজীবনকে বুদ্ধি যুক্তি দ্বারা উপেক্ষা করিয়া শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান এবং সামাজিক সভ্যতার দিকে অতিবেগে ধাবিত হইয়াছিলে, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে মানবীয় ধর্ম্ম লইয়াছিলে, তাই এত বিবাদ অশান্তি। তোমরাও বিশ্বাসী ভক্ত হও। বহুল দেশহিতকর সদনুষ্ঠানের জন্য তোমরা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু তোমরা কি শেষ স্বপ্ন-কল্পনা রহস্যবাদ গুরুমন্ত্র হটযোগ প্রভৃতি দ্বারা বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যভিচার কর নাই? কি আশ্চর্য্য ভ্রম! যার জন্য এত দলাদলি, বিবাদ, শেষ তাহারি অনুসরণ? যোগের রহস্য, ভক্তির মাদকতা সম্ভোগজন্য শেষ কি না ভ্রান্তি কল্পনা অসত্যে প্রশ্রয় দান। এটা তোমাদের পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল। অতিবুদ্ধি এবং ভক্তিবিদ্রোহিতার প্রতিক্রিয়া। সত্যাস্ত্রে এ সব স্বপ্ন কল্পনা ভ্রান্তি কুসংস্কার খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল। এবং যে সকল ব্যক্তি ছদ্মবেশে তোমাদের দলত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মনাম লইয়া নীচ স্বার্থ চরিতার্থের জন্য হিন্দুসমাজের নিকট ঘৃণাস্পদ এবং তোমাদেরও বিদ্রোহী মহাশত্রু হইয়া আছে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দাও।

"হে নববিধানবাদিন্। তোমরা অন্ধভক্তি এবং ধর্ম্মাভিমান বশতঃ উচ্চতর সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম, পবিত্র আদেশবাদের অপব্যবহার করিয়া কার্য্যতঃ মানবীয় সাধারণ ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতার কুটিল আবর্ত্তে পড়িয়াছিলে, তাই আদেশে আদেশে, ঈশ্বরে, ঈশ্বরে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বিচ্ছেদ হইল। তোমরা পক্ষপাত, আত্মপ্রতারণা, ধর্ম্মবঞ্চনা, অসার গর্ব্ব ছাড়িয়া, ভাবগ্রাহী হইয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে মানুষকে ভাল বাসিতে শেখ। বিধানাচার্য্য তোমা-দিগকে যে সকল প্রত্যাদিষ্ট সত্য মত, সত্য পথ, সদৃষ্টান্ত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহার অনুসরণ না করিয়া প্রতি জনে কেন তোমরা প্রত্যাদিষ্ট মহাজন হইতে গিয়াছিলে? হায়! হায়! হায়! এমন কি করিতে আছে? দলাদলি বিষয়ে তোমরা নিতান্তই অধম। দুইটী আত্মাকেও মিলাইতে পার নাই। এক্ষণে মণ্ডলীসম্বন্ধে নব নব আদেশপ্রাপ্তির ভাণ ছাড়িয়া সেই ভক্তের প্রদর্শিত পথে চল। তিনি যে আদি প্রস্রবণের জল পান করিয়াছিলেন তাহাই পান কর। মৃত নিয়মের প্রতি অন্ধানুগত্যও তাঁহার ধর্ম্ম নহে। যোগ বৈরাগ্য এবং ভক্তি প্রেমের ধর্ম্ম এবং ঋষি ভাবের জন্য তোমা-

দের পূর্ব্বপুরুষেরা ভাবীবংশের কৃতজ্ঞতাভাজন সন্দেহ নাই। কিন্তু সামঞ্জস্যের নামে সাম্প্রদায়িকতা, আদেশের নামে খেয়াল, সমন্বয়ের নামে দলাদলি গৃহবিচ্ছেদ, তাঁহাদের এবং তোমাদের এই যে মহা অপরাধ, ইহা অমার্জ্জনীয়।

"এক্ষণে প্রত্যেকে তোমরা মূল সত্যের উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া দেখ, তোমরা তিনে এক। সমস্ত মানবপরিবার এক। যাহা কিছু সত্য তাহা আমাদের সাধারণ সম্পত্তি। জ্ঞানের সত্য, ভাবের সত্য, ইচ্ছার সত্য, আজ দেখ এক হইয়া গেল।

ভাই ভগ্নীগণ! এক্ষণে এই যে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতেছ, এবং মধুর প্রেম সম্ভোগ করিতেছ এই ভাল, না দলাদলি ভ্রাতৃনিন্দা ভাল? তোমাদের সমবেত হৃদয় অমরাত্মা সাধুদিগের সঙ্গে এক হইয়া ঐ শোনো অলৌকিক স্বরে বলিতেছে,—"আমরা দলাদলি চাহি না। কেবল ভাল বাসিতে চাই।"

"কেন মতভেদ দলাদলি হয়? ইহার মধ্যেও শ্রীহরির সুন্দর লীলা আছে। বিশেষ বিশেষ সত্য জ্ঞান ভাব কার্য্য বিশেষরূপে সাধন এবং বিকাশ করিবার জন্য পৃথিবীতে বিশেষ দল প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া কি এক অপরকে ঘৃণা করিবে? মতামতনিরপেক্ষ হইয়া ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সকলকে কি ভালবাসা যায় না? তাহা হইলে তোমরা সঙ্কীর্ণহৃদয় ভেদবাদী ব্রহ্মদ্রোহী হইয়া গেলে। প্রত্যেকের শরীরাভ্যন্তরে যেমন এক রক্ত, এক অস্থি মজ্জা, তদ্বিষয়ে কোন ভেদ নাই; তেমনি প্রত্যেক আত্মার মধ্যে প্রেম, দয়া জ্ঞান ধর্ম্ম পুণ্য বিশ্বাস ভক্তি মূলেতে বস্তুতঃ এক; কেবল কারো একটু বেশী, কারো কম; কারো ঘন, কারো তরল; কারো অমিশ্র, কারো বিমিশ্র। এ জন্য বিবাদ কেন হবে? আপনার সঙ্গে আপনি বিবাদ করিতেছ? আচ্ছা, সত্যের জন্য সংগ্রাম কর; তাহাতে চরিত্র উন্নত হইবে। কে কি ভাবে বিধাতার অভিপ্রায় সাধন করে তাহা কি জান?

"বিশেষ রুচি, জ্ঞান এবং কার্য্যপ্রণালীতে এক হবে না, কিন্তু সাধারণ মূল সত্যে ভাবে প্রেমে এক হবে। ভাবের ভাবুক পথের পথিক বিশেষ বন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠরূপে প্রাণে প্রাণে মিলিত হও, কিন্তু অন্যকেও তাহার মধ্যে টানিতে থাক। না আসে, মূলবন্ধন সাধারণ প্রেম যেন ছিন্ন না হয়। সাধারণ সৎ উদ্দেশ্যে, সাধু কার্য্যে এক হইয়া ক্রমে সেই এক ঈশ্বরকে চিনিয়া লও। হৃদয়ে হৃদয়ে সেই এক দেবতার মূর্ত্তি যে পর্য্যন্ত অঙ্কিত না হয়, তত দিন পূর্ণ মিলন

সম্ভব নয়। প্রত্যেক আধারে এক তিনিই বর্ত্তমান আছেন, সময়ে প্রকটিত হইবেন। ঈশ্বরে ঈশ্বরে কাটাকাটি সকল বিবাদের মূল। যখন মনে হবে, আমারি সেই প্রাণসখা ভ্রাতারও প্রাণসখা, তখন য্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় তিনে এক হইব। বুঝিতে না পারিলেও ইহা সত্য। মিলন এবং বিচ্ছেদের গোড়া এই খানে। সকলের পিতা মাতা সখা সেই একই জন। সকলের প্রতি তাঁর সমান স্নেহ।"

তদনন্তর সেই মহাপুরুষ ভ্রাতৃপ্রেমে মত্ত হইয়া বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক সিংহনাদে বলিলেন, "ভারতসন্তানগণ। এত উদার শিক্ষার পর এখনও কি আমরা গৃহবিবাদে অন্ধ হইয়া থাকিব? নীচতা স্বার্থপরতা বিদ্বেষ হিংসা অভিমান বৃথা গর্ব্ব সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ হউক। মত বিশ্বাস যেমন উদার সর্ব্বজনীন হইল, জীবন তেমনি কেন প্রশস্ত হইবে না? ঘরে ঘরে বিবাদ দলাদলি করিতে কি লজ্জা বোধ হয় না? এ বিষয়ে তোমরা এখন কিছুতেই আর ক্ষমা পাইতে পার না। কর্ম্মক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হউক, বিশেষ বিশেষ সত্য সাধনের জন্য, জ্ঞানচর্চার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাধকদল এবং বিদ্যালয় হউক, কিন্তু সামঞ্জস্য মিলনের দিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে। এক মধ্যবিন্দুতে যেন প্রত্যেকের যোগ থাকে। যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের সহিত বিবাদ করে তাহা ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম তরল হউক বা ঘন হউক, বিচিত্র হউক, বেশী হউক, বা কম হউক, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক হউক, একই পদার্থ, কেবল অধর্ম্মের সহিত তাহার চিরশত্রুতা থাকিবে। সেই সাধারণ শত্রুকে আমরা সকলে মিলিয়া বিনাশ করিব।" (সমবেত জয়ধ্বনি)

"এক্ষণে সকলে মিলিয়া বল, জয় জয় পরব্রহ্মের জয়।" জয় একমেবা-দ্বিতীয়ম্।" এই মহাবাক্য প্রত্যেকের মুখ হইতে আপনা আপনি বাহির হইল, এবং সাগরকল্লোলের ন্যায় সেই মহাধ্বনি আকাশকে প্লাবিত করিল।

সভার কার্য্য শেষে দেখা গেল, সকলের মুখেই আনন্দের চিহ্ন, হাসির জ্যোৎস্না। স্ত্রীলোকেরা গলা ছাড়িয়া আপনাদিগের মধ্যে উৎসাহ আশার কথা বলিতেছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়ের দল নিশান ফুলের তোড়া লুটপাট করিতেছে আর হাসিতেছে; হিন্দি বাঙ্গালা ইংরাজি মহারাষ্ট্র উড়িয়া নানা ভাষার সংঘর্ষণে একটা অপূর্ব্ব ধ্বনি শুনা যাইতেছে। কে কি বুঝিয়া এত উল্লসিত হইল তাহা ঠিক করা বড় কঠিন। বালক যুবক বৃদ্ধ সকলে মহা উৎসাহের সহিত এমনি কোলাকোলি, সেকৃহ্যাণ্ড করিতে লাগিল

যে দুই পাঁচ জনের মাথায় মাথায় ঢুঁ লাগিয়া গেল, কাহারো দাঁতে রক্ত পড়িল। ছোট ছেলেরা তাহা দেখিয়া আহ্লাদে মারামারি কিলাকিলি আরম্ভ করিল। মহিলাগণও আপনাদের মধ্যে আলিঙ্গন চুম্বন গাত্রস্পর্শ করস্পর্শ, যিনি যাহা ভাল বাসেন তাহা দ্বারা মনের অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। সভা ভঙ্গের পর কিছু কিছু মিষ্টান্ন বরফের জলও সকলের উদরকে শীতল, মুখকে মিষ্ট করিয়া দিল। মহামিলন সভার মস্তকে স্বর্গের দেবতাগণ পুষ্প বর্ষণ করিলেন। অনন্তর সহাস্য মুখে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আপনাপন আলয়ে সকলে চলিয়া গেলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

তিন দল ব্রাহ্ম এক হইলে যে কি মহাশক্তি সমুৎপন্ন হয়, তাহার শোভা দেখিতে যে কি সুন্দর, তাহা আমরা দেখিলাম। ভাদ্রের মহাবেগশালিনী পদ্মা নদীর বিঘূর্ণিত আবর্ত্ত যেরূপ দুর্জ্জয় বলে বহু দূর হইতে তরণী সকলকে আকর্ষণ করে, ব্রাহ্মসমাজ এখন সেইরূপ পরাক্রমশালী হইল। "ব্রাহ্মসমাজ" এই পুরাতন নামটী শুনিয়া কেহ যেন ক্ষুব্ধ না হন। এক্ষণে ইহা সকল সম্প্রদায়ের হৃদয়ের প্রিয় সামগ্রী। আর্য্যের আর্য্যত্ব, খ্রিষ্টীয়ানের খ্রিষ্টত্ব ইহাতে বর্ত্তমান। জ্ঞানী ধনী গুণী কত লোক যে আসিয়া জুটিল তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। বার মাস, ত্রিশ দিন যেন উৎসব। এক দিকে যেমন বাহিরে কার্য্যসমারোহ, লোকসমারোহ, অপর দিকে আত্মা এবং হৃদয়কে যোগ ভক্তিতে পূর্ণ করিবার জন্য বিশ্বম্ভর এবং তদীয় সহচরগণের তেমনি উৎসাহ ব্যাকুলতা। বিশ্বম্ভর যে উপাসনা প্রার্থনা করিতেন তাহা দ্বারা তিনি উপাসকবৃন্দকে ঈশ্বর দেখাইয়া দিতেন। এইটীই তাঁহার বিশেষ গুণ ও মহত্ত্ব ছিল। তদ্দ্বারা লোকের চিত্ত পরিবর্ত্তিত, ভাবান্তরিত হইত। এক মাসের মধ্যে এইরূপে সমস্ত একবারে জম জমাট হইয়া গেল। নব-যুগধর্ম্মের লক্ষণ সকল স্পষ্টীকৃত হইল। নিতান্ত যে অকর্ম্মণ্য নির্গুণ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল সেও এখন কর্ম্মক্ষম সুযোগ্য ব্যক্তি হইল। জ্ঞান

প্রেম সাহস উৎসাহ বদান্যতা আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চস্পৃহা, সমস্ত সাধু গুণ প্রেমের বসন্তসমীরণ স্পর্শে একবারে যেন রাতারাতি ফুটিয়া উঠিল।

ইহারই উপর আবার পর বৎসরের মহোৎসব। নিত্য উৎসবময় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক মহোৎসব। আহা আমার সহযোগী ভাই বন্ধুরা যদি এই স্বর্গীয় দৃশ্যটী এক দিনের জন্যও দেখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমি বড় আহ্লাদিত হইতাম। কেবল কষ্ট পাইয়া, ভ্রাতৃবিরহানলে জ্বলিয়া, বিবাদ তর্ক করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহারা পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র, ব্রহ্মানন্দ কেশব আজ এখানে থাকিলে তাঁহাদের মনে কি অতুল আনন্দই না জন্মিত! যাহারা বপন করে, তাহারা ফল ভোগ করিতে পায় না। অথবা অপরের সুখেই তাঁদের সুখ। যুগে যুগে বংশপরম্পরা বিভিন্ন আধারে তাঁহাদেরই আত্মার পুনরুত্থান হয়।

এ কি আর সে গত শতাব্দীর উৎসব, যে শত খানেক লোক রোগা রোগা গোটাকতক শালু কাপড়ের নিশান ধরিয়া ক্ষীণকণ্ঠে অমিল সুরে গান গাইতে গাইতে নগরের পথে চলিতেছে? পুষ্পমালাজড়িত বিচিত্র বর্ণের হাজার হাজার সিল্ক সাটিনের নিশানে দিক্ আলোকিত করিয়া, দশ সহস্র ভক্ত সিংহ সহস্রদলে বিভক্ত হইয়া বাঙ্গালা হিন্দি উড়িয়া মহারাষ্ট্র তৈলঙ্গী এবং ইংরাজি ভাষায় বজ্রনির্ঘোষে হরিনাম গান করিতে করিতে ঐ দেখ মহা নগর মাতাইয়া তুলিল। আহা কি সুরের মিল। যেন এক খানি কণ্ঠস্বর। বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের কি মধুর গম্ভীর সামঞ্জস্য। মৃদঙ্গের বাদ্য কর্ণে প্রবেশমাত্র প্রাণের ভিতর যেন গুর গুর করিয়া উঠে। ভক্তবৃন্দের কি অপূর্ব্ব মুখশ্রী! যেন স্বর্গ মর্ত্ত্য এক হইয়া গিয়াছে। দেবলোক নরলোকের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিয়াছেন। পথের মাঝে মাঝে জীবনের ঘটনাপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতা। তাহার সহিত নৃত্য গীত। রাজপথের দুই ধারে, গাছের উপরে, ছাদে, লক্ষ লক্ষ শ্রোতা অবাক্ হইয়া সে শোভা দেখিতেছে। শত শত লোক অবশভাবে অজ্ঞাতসারে দলে মিশিয়া হরি হরি বলিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের হরিসঙ্কীর্ত্তনে হিল্লোলিত ভারতাকাশ আবার হরিধ্বনিতে আলোড়িত হইল। এ দেশের বাতাস হরিনামের সুগন্ধে পরিপূর্ণ, তাহার নিশ্বাসে পাপী উদ্ধার হয়।

যে কখন গীত গায় নাই সেও গীত গাইতেছে। "নগর টল মল টল মল করিছে, হরিপ্রেমের হিল্লোলে রে!" এই গান যখন সকলে গাইতে লাগিল, তখন সমস্ত শ্রোতা দর্শক গায়ক এককালে পাগল হইয়া উঠিল। কে কি

বলে, কে কি করে, কিছুই বুঝিবার যো নাই। ইহাকেই বলে ধর্ম্ম বিধান। গৌরভাবে মত্ত বিশ্বম্ভর যেন মোহমন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া এই বিপুল লোকসঙ্ঘকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন। আমি নিতান্ত স্থবির দুর্ব্বল, তথাপি অজ্ঞাতসারে দলের পশ্চাতে পশ্চাতে বহু দূর গিয়াছিলাম। শেষ ফিরিয়া আসিবার সময় আর চলিতে পারি না।

এই সংকীর্ত্তনের অনুরূপ আবার উপাসনা, সৎপ্রসঙ্গ, প্রচার এবং সভা সমিতি কাজকর্ম্ম। পান ভোজন গল্প কথোপকথন আমোদ, সমস্ত বিষয়েই জীবন্ত ভাব। পুনর্ম্মিলিত ভ্রাতৃবৃন্দ প্রেমপুলকিত হৃদয়ে তখন বলিতে লাগিলেন, "আমরা ত সেই এক ঘরেরই লোক, এক মায়ের ছেলে, এক স্তন্যদুগ্ধে মানুষ হইয়াছি। কেন যে এত কাল দলাদলি বিবাদ বিচ্ছেদ চলিয়া আসিয়াছে, এখন তাহা কিছু যদি বুঝিতে পারি।" বিচ্ছেদের পর মিলন বড় সুখের অবস্থা। ঘর বজায় হইল, সকলে এক সঙ্গে মিলিলেন, আমারও মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের ভার নামিয়া গেল ; বাঁচলাম!

এই সঙ্গে যাদের যাদের বাকী ছিল একবারে কতকগুল মেয়ে পুরুষের বিবাহ হইয়া গেল। অনেক প্রাচীনা কুমারী গৃহধর্ম্মের শীতল ক্রোড়ে প্রবেশপূর্ব্বক হাড় জুড়াইলেন। এই সকল মাঙ্গলিক ক্রিয়া উপলক্ষে ভ্রাতৃভাব ভগ্নীভাব অতিশয় ঘনীভূত হইল। পরস্পর তিন দলের লোকেরা বিবাহ করে, আর হাসিয়া বলে, "ভাই, প্রভেদত কিছু দেখিতে পাই না! কি বিপদ! এত দিন আপনার জনকে আমরা পর মনে করিতাম!"

এখন আর কেহ সেই প্রচলিত সাধারণ হিন্দু বা খ্রীষ্টানদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহে না। সত্যেরই জয়, অসত্যের জয় কোথায় কবে হইয়াছে? কাজেই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী ব্রাহ্মসমাজেই সকলে আসিতে লাগিল। হিন্দু এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম, শাক্ত বৈষ্ণব সমস্ত ধর্ম্মের ঘনীভূত সারভূত পদার্থ এই খানে, অন্য স্থানে যাইবার প্রয়োজনই বা কি? সরল হৃদয় ধর্ম্মপিপাসু হিন্দুসন্তানগণ বলিতে লাগিলেন, "যেখানে ঋষিদিগের যোগ বৈরাগ্য সমাধি, সদাচার আত্মসংযম তপোনিষ্ঠা শুদ্ধ নীতি জীবনে প্রকাশ পায় সেই খানেই হিন্দু ধর্ম্মের আর্য্যভাব বর্ত্তমান। আমরা সেই দলেই মিশিব। বৃথা আড়ম্বর ভক্তিহীন বাহ্য পূজা, কুসংস্কার অজ্ঞানতা জাতি কুলের অভিমানে কি ফল? যাহারা অনার্য্য, অশিক্ষিত বেদবিমুখ জনসাধারণ তাহারা সে সকল লইয়া থাকুক।" ভাল ভাল দেশীয় ভক্ত খ্রীষ্টান যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদেরও ঐ

কথা। তাঁহারা বলিলেন, "খ্রীষ্টের জীবন্ত ভাব যেখানে আছে সেই খানে আমরা যাব। ব্রাহ্মসমাজের খ্রীষ্টই সার আধ্যাত্মিক খ্রীষ্ট, আমাদের আধুনিক খ্রীষ্ট কল্পনানির্ম্মিত, রক্ত মাংসে গঠিত, তাহা আত্মার মধ্যে প্রবেশ করে না। অতএব মহাত্মা কেশবচন্দ্র যে খ্রীষ্টের কথা বলিয়া গিয়াছেন আমরা তাহাই চাই।" বৌদ্ধেরাও এখানকার নির্ব্বাণ শান্তি দয়ার কার্য্য দেখিয়া বুঝিল, প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম শাক্যচরিত ব্রাহ্মসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারাও ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট হইল। কেবল মুসলমানেরা বড় ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। নিরাকার একেশ্বরবাদ এবং মহোম্মদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মানের জন্য ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে তাহারা সহানুভূতি করিত বটে, কিন্তু শান্ত স্বভাব ভক্তিরসবিগলিত নিরীহ ব্রাহ্মদিগকে সংগ্রামবিমুখ দেখিয়া বলিত, "ইযে লোক'সব্ জেনানী হ্যায়।" ইহা ব্যতীত এ সময়ের জ্ঞানী এবং যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে উদারতা এবং সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইত। নিজ নিজ সম্প্রদায়ে বদ্ধ থাকিয়াও তাহারা অন্য সম্প্রদায়ের শাস্ত্র গুরু এবং সুনিয়মকে শ্রদ্ধা এবং আদর করিতে শিখিয়াছিল। এই জন্য এক অর্থে সমস্ত পৃথিবীই যেন এই বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া এখন বোধ হয়। পুরাতন ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি প্রাইমারি স্কুল বিশেষ, তাহাতে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ ব্রাহ্মসমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সামঞ্জস্য ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সুতরাং বিবাদ আর রহিল না, সমস্ত এক প্রণালীর অন্তর্গত, এক কর্ত্তার অধীন হইয়া গেল। এইরূপে ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে জ্ঞানবান্ ধর্ম্মপিপাসু উচ্চশ্রেণীর এবং মধ্যম শ্রেণীর বহুলোক এবং সাধারণ শ্রেণীর সরল মতি এবং ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিরা সকলেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করিল। পড়িয়া রহিল কেবল, জ্ঞানাভিমানী অবিশ্বাসী নাস্তিক স্বেচ্ছাচারী, আর যাহারা নিতান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাসী জড়মতি অহঙ্কারী লোক।

বিশ্বম্ভরের মহজ্জীবনের দৃষ্টান্তে যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম এইরূপ বিশুদ্ধ উদার এবং পূর্ণবিকসিত সার্ব্বভৌমিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, তখন ইহাই হইল জাতীয় অর্থাৎ বিশ্বজনীন আর্য্যধর্ম্ম এবং ভারতের ধর্ম্ম। ইহার প্রভাব জল বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া, সূর্য্য কিরণের ভিতর দিয়া সমস্ত সভ্য জগতের উপর ছড়াইয়া পড়িল। সর্ব্বদেশীয় যাবতীয় ধর্ম্মের প্রাচীন সুনিয়ম, সার

ধর্ম কিছুই বিনষ্ট হইল না, কিন্তু তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে পরিপূর্ণ হইল। দেশীয় স্বভাবের সহিত বৈদেশিক সভ্যতা, জ্ঞানের সহিত ভক্তি, কর্ম্মের সহিত যোগ, গৃহধর্ম্মের সহিত বৈরাগ্য, মত্ততার সহিত শান্তি, গভীরতার সহিত বিস্তৃতি, পবিত্রতার সহিত প্রেম, গদ্যের সহিত পদ্য, বিজ্ঞানের সহিত বিশ্বাস, ধর্ম্মের সহিত রাজকীয় শাসন, আত্মমর্য্যাদার সহিত বিনয়; এই সমস্ত বিপরীত গুণের সামঞ্জস্য হইল।

কেবল যে শাস্ত্র বিধি মত জ্ঞান এবং নৈতিক নিয়মের সমন্বয় হইল তাহা নহে; বিচিত্র প্রকৃতির মানুষগণের মধ্যে এমনি সদ্ভাবে কার্য্য চলিতে লাগিল, যেন এক খানি সুগঠিত সুনিয়মিত যন্ত্র। যিনি যে কাজের জন্য বিশেষ উপযুক্ত এবং চিহ্নিত তিনি সেই বিভাগের কর্ত্তা হইলেন। অপর অথবা সহকারী সকলের সহিত তাঁহার কোন আঘাত প্রতিঘাত লাগে না। যাহার যে স্থান সেখানে তিনি বসিলেন। স্থান কর্ত্তৃত্ব কার্য্যবিভাগ সমস্ত এমনি পরিষ্কাররূপে নিয়মিত হইল যেন একটী ঐকতানিক বাদকের দল। নিজ নিজ পদে সকলেই সুখী হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। একদিকে নবোৎসাহে নবভাবে কাজ কর্ম্ম, অপর দিকে গভীর যোগের এবং প্রগাঢ় ভক্তিরসের উপাসনা সাধন ভজন; দিন রাত্রি যেন কাণে অনুরাগের সুর লাগিয়াই আছে। উপাসনা এবং প্রিয়কার্য্য সাধন দুই এক সুরে মিশিয়া গেল। উপাসনা আরম্ভ হইতে না হইতে, খোলে ঘা পড়িতে না পড়িতে আত্মা আনন্দে বিভোর, ভক্তিতে চক্ষু ছল ছল, প্রেমে শরীর পুলকিত। উদ্বোধন আরাধনা ধ্যান প্রার্থনা সঙ্গীত উপদেশ শান্তিবচন সমস্ত যেন এক খানি অখণ্ড পদার্থ; বিদ্যুতালোকের ন্যায় সচ্চিদানন্দ লীলাময় হরি তন্মধ্যে খেলা করিতে লাগিলেন। যোগের বিশ্রাম নাই, ভাবেরও বিচ্ছেদ নাই, কার্য্যেও আলস্য নাই। বিশ্বগুরু যেন ভগবান যাদুকরের ছড়ি হইয়া প্রতি দিনের উপাসনায় এইরূপ ভোজবাজী করিতে লাগিলেন। তদীয় মুখবিনিঃসৃত ভগবৎগুণানুকীর্ত্তন তড়িতের ন্যায় হৃদয় হইতে হৃদয়ে সঞ্চরণ করিত। চেষ্টা যত্ন সংগ্রাম করিয়া তাহাতে যোগ দিতে হইত না, সহজে আপনাপনি সেই উপাসনার বাতাস আত্মার ভিতরে প্রবেশ করিত, এবং তাহার হিল্লোলে হৃদয়সিন্ধু মহাবেগে উছলিয়া উঠিত। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, অজ্ঞ বিজ্ঞ কেহই জানে না কি করিতেছ, অথচ সকলেই ভাবে ভোর। গণ্ডস্থল বহিয়া চক্ষু হইতে নির্ঝরের ন্যায় বারিধারা ছুটিতেছে, কণ্ঠ

হইতে অবরুদ্ধ অস্ফুট শব্দের হরিধ্বনি উঠিতেছে, হৃদয় মর্ম প্রাণ ভাবে গদ্গদ, জিজ্ঞাসা করিলেও কেহ কিছু স্পষ্ট কথায় বলিতে পারে না। সে স্বর্গীয় ভাবের ভাষা তাহারা কোথায় পাবে? তাই গোলমাল করিয়া কে কি বলে কিছু বুঝা যায় না. ব্যাকরণ বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলে না; কিন্তু সেই অসংলগ্ন প্রলাপবৎ বাক্য, চক্ষের জল, কণ্টকিত পুলকাঙ্গ, স্থির গম্ভীর ভাব, উদ্দণ্ড নৃত্য ও প্রেমমত্ততার ভিতর দিয়া আভ্যন্তরিক ভাবের সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইত। ভাবুক রসগ্রাহী কেবল তাহা বোঝে। বুঝিয়া হাসে।

ধর্ম্মরাজ্যে আর কি চাই? নববিধানের নববসন্তে হৃদয় উদ্যান নানা ফল ফুলে সুশোভিত হইল, শুষ্ক প্রাণ আরাম শান্তি লাভ করিল। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল সমাজসংস্কারক ব্যক্তি কেবল কাজ কর্ম্ম সভা সমিতি কমিটী সবকমিটী নিয়ম নির্দ্ধারণ যুক্তি বিজ্ঞান লইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইত, গণ্ডায় গণ্ডায় বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ দিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, "যথেষ্ট হইয়াছে, আর না; এখন দিন কতক এইরূপে যোগসুধা পান করি আর ভক্তিরসে মাতিয়া হরিনাম গাই। কতকগুলা লোক সংখ্যা বাড়াইয়া আর কি হবে? বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেল, কি যৌবন এবং বৃদ্ধ কিম্বা বিধবা অসবর্ণ বিবাহ চলিত হইল তাহাতে কি হইবে? আমি কি তাহাতে মুক্তি পাইব? এ সব সংসারের ব্যাপার আপনিই চলিবে। সাধন ভজনের দিকে তাঁদের ঝোঁক গেল।

যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে সভ্যতাভিমানী জ্ঞানী এবং বক্তা উপদেষ্টা ও পুস্তক পত্রিকালেখক ছিলেন, যাঁহারা নিজে লিখিয়া নিজেই পড়িতেন আর মনে মনে ভাবিতেন "আহা! আমার কি গুণই জন্মিয়াছে।" তাঁরাও এখন বলিতে লাগিলেন, "মস্তিষ্ক এবং চক্ষু শুকাইয়া গিয়াছে, আর ভাল লাগে না। স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী স্বাধীনা হইয়া মেমেদের মত যদি পোষাক পরেন, ইংরাজি কথা কন, টেবিলে পান ভোজন করেন, কিম্বা তাঁহারা যদি প্রকাশ্যে বড় বড় বক্তৃতা দেন, বা পুস্তকই লেখেন, তাতে কি হবে? আমি কি তাহাতে হৃদয়ে শান্তি পাব? সকল সখ মিটিয়াছে, আর কাজ নাই, এক্ষণে হরিচরণামৃত পানে প্রাণের পিপাসা মিটাইতে চাই, আর প্রাণসখা হরিকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে চাই।"

এ সমস্তই ভক্তির লক্ষণ। আচার্য্য উপাচার্য্য প্রচারক সকলেই ধর্ম্মে

মন দিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "আগে আপনাকে বুঝাই, তার পর অপরকে বুঝাইব। আগে শিখি, তার পর শিখাইব। আগে করি, তার পর করিতে উপদেশ দিব।" অপর দিক হইতে কাজ করিবার খাটিবার লোকও এ যুগে অনেক পাওয়া গেল। তাঁহারা বলিল, "আমরা ঈশ্বর পদধূলি মাথায় লইয়া, তাঁহার অপমান নির্য্যাতনের অংশভাগী হইয়া জনহিতব্রতে প্রাণ উৎসর্গ করিব।"

এক দল বলিষ্ঠ উৎসাহী যুবা কেবল মণ্ডলীর লোকের দুঃখ অভাব মোচনের জন্য ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিত। এক দল কেবল দ্বারে দ্বারে হরিনাম গাহিয়া বেড়াইত। আর এক দল রাজনৈতিক ও সাধারণ হিতানুষ্ঠানে ব্রতী রহিলেন। বিধবা এবং চিরকুমারীগণ রোগী এবং দরিদ্র অনাথদিগের সেবা করিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞ বহুদর্শী প্রাচীন ভক্তগণের অভিজ্ঞতা সৎপরামর্শ সমীচীন সিদ্ধান্ত তেজস্বী কর্ম্মদক্ষ উৎসাহী যুবাদিগের নবানুরাগ সজীব ভাব অকাতর পরিশ্রম, ত্যাগস্বীকার এবং উন্নতিশীল নবীন বুদ্ধির সহিত মিলিয়া এমনি আশ্চর্য্যরূপে সমস্ত কার্য্য চলিতে লাগিল, যে দেখিলে নয়ন জুড়ায়। এক পুরুষে যাহাতে ধর্ম্মোন্নতি বন্ধ না থাকে, ক্রমাগত চলে, তাহার উপায় হইল। যুবা বৃদ্ধের এমন সামঞ্জস্য পূর্ব্বে আর কখন কেহ দেখে নাই। একটী সামান্য প্রাণীও অব্যবহার্য্য পরিত্যক্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিল না। ছোট বড় উচ্চ নীচ সকলে নিজ নিজ স্থানে স্বাধীন ভাবে সুখে কার্য্য করিতে লাগিল। যুবা বৃদ্ধ বালক তিনেরই সামঞ্জস্য এবং পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়া গেল।

বিশ্বম্ভর যেন জীর্ণাস্থি মৃতদেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখন ভগবান্ আর নিদ্রিত দূরস্থিত দেবতা নহেন। তিনি সর্ব্বদা সকলের কাছে কাছে ফিরিতে লাগিলেন। তিনি নিজেই উপদেশ দেন, শাসন করেন ভাল বাসেন, এবং হাত ধরিয়া চালান। এইরূপে তিনি নিজে যখন সকল ভার লইলেন তখন সব ঠিক হইয়া গেল। বিধান পূর্ণ হইল।

জ্ঞানী যুবকেরা মনে করিতে পারেন, "পৃথিবীতে কি এরূপ কখন সম্ভব ? এ সব কবির কল্পনা।" এরূপ মনে হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তোমাদের ত হইতেই পারে, আমি নিজেই দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইতেছি আর অধিক কি বলিব! কিন্তু আর এক দিকে দেখিতে গেলে

নাই হবে কেন? মানবস্বভাব এবং নিয়তির এই দিকে গতি, ভগবানের অনন্ত মঙ্গলময়ী ইচ্ছাশক্তিও এই দিকে তাহাকে টানিতেছে। ঠিক সময়েই ঠিক কাজ হয়। মানবজীবনের বিচিত্র রুচি এবং কুটিল গতি, তাহাদের বিভিন্ন প্রকৃতির সামঞ্জস্যের জন্য পূর্ব্ব শতাব্দীর ভক্ত এবং জ্ঞানীদিগকে কত বারই না বিড়ম্বিত লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। তখন সময় পূর্ণ হয় নাই, সামঞ্জস্য হবে কেন? কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা পরিশ্রম, সংগ্রাম এবং নিষ্ফলতা বর্ত্তমান সফলতার গূঢ় কারণ। এক যুগের চেষ্টা অপর যুগে ফলবতী হয়। অতএব অল্পবিশ্বাসী কুতার্কিক সঙ্কীর্ণমনা হইয়া আর কেহ এ বিষয়ে ভুল ধরিও না, সিদ্ধিদাতা বিধাতাকে এ জন্য ধন্যবাদ কর, তাঁহার মঙ্গল সঙ্কল্পে দৃঢ় বিশ্বাসী হও, পরিত্রাণ পাইবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নলিনীকান্ত বাবু যে দিন নিরঞ্জনাকে পুনর্গ্রহণ করিয়া শান্তিধামের আশ্রয় লইলেন, সেই দিন দিবাকরের সহিত উল্লাসিনী, দীনেশের সহিত উর্ম্মিলার বিবাহ হইল। পুনর্ম্মিলন ও বিবাহোৎসবে মত্ত হইয়া সে দিন সকলে শান্তিধামে মহাদেবের মহাপূজা করেন। এই সঙ্গে বিশ্বম্ভরও বসুন্ধরার সহিত আধ্যাত্মিক বিবাহ সূত্রে সম্বদ্ধ হন। মহাসমারোহের ব্যাপার। সে দিনকার উপাসনার অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনাতীত। এরূপ আর কখন দেখা যায় নাই। ভক্তবৃন্দের ব্রহ্মজ্যোতিবিভাসিত হৃদয়ফলকে নববৃন্দাবনের ছবি সহসা প্রতিফলিত হইল। বিশ্বম্ভর সে দিন নববৃন্দাবনের ভাবে উপাসনা আরাধনা করেন। ঠিক স্পষ্ট যেন সকলে আপনাপন হৃদয়পটে নববৃন্দাবনের ছবি দেখিতে লাগিলেন। আনন্দের আর সীমা নাই। এই ছবি দেখিতে দেখিতে শেষ সকলে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। সুচেৎ সিংহ মহারাজ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহাভাবে উত্তেজিত হইয়া একবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন;—

"ভক্তগণ! আজ আমার মস্তকে তোমরা পদধূলি প্রদান কর। আমি বিপুল রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। যাহা ভাবিয়াছিলাম

তাহা হইল না। রাজপদে রাজকার্য্যে যত লোকের সঙ্গে মিশিযাছি, এক জনকেও হৃদয়ের বন্ধু, আত্মার সখা বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। সকলেই মনে মনে হিংসা করে, বাহিরে আজ্ঞাবহ দাস হইযা মিষ্ট কথা বলে। দিব্যজ্ঞানে পরিস্কার বুঝিলাম, কেহই আমার নয়। তবে আর কেন আমি এই গুরুতর রাজ্যভার বহন করিব? নিজের ভোগ সুখের জন্য? তাহাতে অরুচি জন্মিযাছে। অহঙ্কার উপাধি মর্য্যাদা রাজসিংহাসন প্রভুত্ব মান সম্ভ্রম? ইহাতে আর হৃদযপিপাসা দূর হয না। হায! বন্ধু বলিযা প্রেমের চক্ষে আমাকে কেহ দেখে না, বিষযবণিক জানিযা স্বার্থের জন্য লোকে কেবল মুখে আত্মীযতা দেখায; কিন্তু সে ত আত্মার আত্মীযতা নহে? আমিও প্রাণ খুলিয়া বন্ধু বলিযা কাহাকেও স্বীকার করিতে পারি নাই। ভ্রাতৃগণ, হে ভক্তগণ, আমার হৃদয এই দেখ খালি পড়িযা রহিযাছে। তোমরা সে স্থান পূর্ণ কর। বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইযা কেবল ব্রহ্মসন্তানগণের নীচতা স্বার্থপরতা কৃত্রিম প্রণযেরই পরিচয পাইলাম মনুষ্যত্বের ভিতর দেবত্ব দেখিতে পাই নাই। এই জন্য তাহাদের প্রতি কেবল ঘৃণারই উদয হইত। তাহাদিগকে লোভী কুক্কুরের মত জানিযা সেই ভাবে তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতাম। ইহাতে আমারও অন্তঃকরণ নীচ এবং কঠিন হইযা গিযাছে। হায! প্রচুর ভোগ বিলাসে, বিপুল ঐশ্বর্য্যসুখে আমার মনত কৈ উচ্চ হইল না! আমি প্রবৃত্তির দাস। কর্ম্মচারীদিগের সহিত দেবীনগর রাজ্য লুট করিবার জন্যই যেন আমি এত দিন রাজপদে অভিষিক্ত ছিলাম। সকলেই চোর, আমি যেন চোরের সর্দ্দার। দূর হউক! রাজ্য ঐশ্বর্য্য আর আমি চাহি না। এখন আপনাদের দাস হইযা সঙ্গে থাকিব। দেবীনগরের রাজ্য দেবী স্বয়ং তাহার সাধু সন্তানগণ দ্বারা শাসন এবং পালন করুন। আমি সমস্ত ভার ভক্তদরবারের হস্তে অর্পণ করিলাম।"

এই বলিযা তিনি রাজবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্যবেশ ধারণ করিলেন। রাজমহিষীও স্বামীর সঙ্গিনী হইলেন।

মহারাজার তাদৃশ ভাবগতি দেখিযা জমিদার আশুসুখ বাবুর মনে বড় ধিক্কার বোধ হইল এবং তাহাতে বৈরাগ্যের আগুন জ্বলিযা উঠিল। তিনিও পৃথিবীর অসারতা হৃদযঙ্গম করিযা অনুতাপপূর্ব্বক ভক্তদলে মিশিলেন।

ইহাদের মহাবৈরাগ্য অলৌকিক পরিবর্ত্তন দর্শনে পুরাতন ব্রাহ্ম-সমাজের সেই পুরাতন আচার্য্য উপাচার্য্য প্রচারকগণ চীৎকার স্বরে

কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন প্রার্থনার একটা "বড় গণ্ডগোল উঠিল।" কেহ অবরুদ্ধ কণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে, কেহ ভাবাতিশয্যে অধৈর্য্য হইয়া, কেহ বা নীরবে কেবল শ্বাস প্রশ্বাস অশ্রুবারি দ্বারা প্রার্থনা করিতেছেন। কেহ বিশ্বম্ভরের পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। কেহ বা ব্যাকুল হৃদয়ে অপর ভক্তের গলা জড়াইয়া কাঁদিতেছেন।

প্রেমিক বিশ্বম্ভর যখন এই স্বর্গীয় দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিলেন, তখন তিনি একবারে আপনাকে অনন্ত প্রেমপারাবারে হারাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার শরীর নিস্পন্দ, নয়নে অবিরল অশ্রুধারা; মুখমণ্ডল এবং ললাটে স্বর্গের জ্যোতি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সে রূপে "মানুষে হরি বিরাজ করে, নরহরি রূপ ধরি" এই কথাই কেবল স্মরণ করাইয়া দেয়। মহাভাবের মহাদশায় পড়িয়া তিনি আর অধিক কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে,গদ্গদ স্বরে উন্মীলিত ঊর্দ্ধনেত্রে বলিলেন, "ঠাকুর, এত শীঘ্র পৃথিবীতে স্বর্গ দেখিব, এরূপত আশা করি নাই' মা, একটী প্রাণের ভাইকে পাইবার জন্য আমার ধর্ম্মপিতা ব্রহ্মানন্দ তোমার নিকট কতই কাঁদিয়া গিযাছেন। আমাকে তুমি শত শত ভাই ভগ্নী দিলে, ধরাতলে স্বর্গ দেখাইলে। এ সমস্ত ভাই ভগিনী, এই প্রেমপরিবার তাহার হউক। আমরা প্রতি জন প্রতি জনের হইয়া অমরাত্মা ভক্তগণের হই,এবং সকলে মিলিযা তোমার হই।"

উদ্বেলিত মহাসিন্ধুবক্ষে তৈল পতিত হইলে যেমন তাহা নিস্তব্ধ শান্ত হয়, ভক্তবৃন্দের উত্তাল তরঙ্গায়িত হৃদয় এই বচনে তেমনি পরম শান্তি প্রাপ্ত হইল। ক্রন্দন কোলাহল থামিয়া গেল। তখন নিরঞ্জনা দণ্ডায়মানা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "দয়াময, তোমার লীলাবিলাস দেখিয়া প্রাণ যে আমার বড় আকুল হইল। আহা! এ দাসীকে তুমি কৃতার্থ করিলে। কোথায় দিয়া কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে আমাকে এত দিন তুমি চালাইলে তাহা বুঝিতেও দাও নাই। অথচ ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আসিয়া পৌছিলাম। দয়াল প্রভু, আমি যেন তোমার চিরদাসী সন্ন্যাসিনী হয়ে ঘরকন্না এবং জীবসেবা করিতে পারি।" প্রভূত ভাবোদ্গমে তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইল, স্বর ভঙ্গ হইয়া গেল, সুতরাং আর কথা কহিতে পারিলেন না। তিনি চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দেবপ্রতিমাবৎ সভামণ্ডল সমুজ্জ্বলিত করিয়া সেই ভাবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে অনুপম দেবশ্রী দর্শনে ভক্তগণের হৃদয় আরো শান্তিপূর্ণ মধুময় হইল।

অতঃপর ভাবে ভোর হইয়া অনুতাপের সহিত নলিনীকান্ত, তার পর দিবাকর, তার পর উর্ম্মিলা এক একটী প্রার্থনা করিলেন। উর্ম্মিলার আর এখন সে বেশ ভূষা নাই। তিনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া, গৈরিক বসন পরিয়া, করে একতন্ত্রী লইয়া সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরিযাছেন। আধ্যাত্মিক উদ্বাহব্রতপ্রার্থিনী বসুন্ধরা যেন আজ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী মাতৃরূপিণী। তাঁহার নয়নে ললাটে গণ্ডস্থলে মুখমণ্ডলে মাতৃস্নেহ মূর্ত্তিমান হইযা বিরাজ করিতেছিল। দিবাকরেরও আর সে বৈদেশিক বেশ ভূষা নাই। তিনি এক খানি চাদর গায় দিয়া গরিবের মত একপার্শ্বে বসিযা আছেন। আহা সেই দীন বেশের কি চমৎকার শোভা!

অনন্তর ক্রমে ভাব এবং মহাভাবের জমাট বাঁধিয়া গেল; কেহ আর উঠিযা যে কোথাও যাবেন তার যো নাই। প্রেম ভক্তিতে গলিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সহিত সকলে অভেদ ভাব ধারণ করিলেন। প্রকৃত প্রেমের দরবার তখন হইল। এক জন যাহা বলেন, প্রত্যেকের হৃদয়ে তাহার প্রতিধ্বনি উঠে। এই একাত্মতা, সমহৃদয়তা, সমজ্ঞান জনসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজের গবর্ণমেণ্ট। লোকপ্রতিনিধি উন্নত ভক্ত দ্বাদশটী আত্মা মিলিত হইয়া পরে ধর্ম্মরাজ্য পালনে নিযুক্ত হন। তাহার নাম "প্রেমের দরবার।"

হৃদয়নাথ ভাবে গদ্গদ হইয়া আনন্দাশ্রুবিগলিত নেত্রে বলিলেন, "আমাদের নাম কি হইবে?"

ইহা শুনিযা হাসির লহর উঠিল। মহাশব্দে সকলে অট্টহাসি হাসিলেন। কিন্তু কেহ উত্তর দিতে পারিলেন না। বিশ্বম্ভর বলিলেন, "কোন নামে আমাদের প্রযোজন নাই, আমরা এখন কিছু কাল বস্তু ভোগ করি। ভগবান নামকরণ করিবেন। এখানে আর তুমি আমি থাকিবে না, সব আমি!"

দীনেশ। আহা হা হা! বেশ কথা, সব আমি।

সুচেত। আমি এবং আমরা।

বিশ্ব। সেও উত্তম কথা।

আশু। আচ্ছা ইহার ভিতর হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টীযান বৌদ্ধ পার্সী জৈন য়িহুদী ব্রাহ্ম শিখ বৈষ্ণব ফকির উদাসী গৃহস্থ জ্ঞানী মূর্খ ধনী দরিদ্র সকলে স্থান পাবে কি না?

বিশ্ব। প্রেমমহাদ্রাবকে গলিযা সকলে এক হইযা যাইবে। বিচিত্রতার ভিতর একতা এবং একতার ভিতর বিচিত্রতা, এই শেষ লক্ষণ।

দীনেশ। তাহা হইলে ব্যক্তিত্ব কোথা যাবে ?

বিশ্ব। ব্যক্তিত্ব থাকিবে মা আনন্দময়ীর বক্ষে। অনন্ত কোটী সন্তান তাঁহার অনন্ত প্রেমবক্ষে শুইয়া শুইয়া প্রেমসুধা পান করিবে। ভাই ভগ্নীগণ, তোমরা মানুষকে আর সামান্য মানুষ জ্ঞান করিও না, প্রত্যেকের ভিতর ব্রহ্মখণ্ড দর্শন কর।

এই বাক্য শুনিবামাত্র সভাশুদ্ধ সকলে পরস্পরের পায়ে গড়াগড়ি দিয়া নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন। কেহ কাহারো কোলে শুইয়া পড়িলেন। এক জন আর জনের পা টিপিয়া দিতেছেন। কেহবা কাহাকে কোলে লইয়া এবং কাঁধে তুলিয়া নাচিতেছেন। কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ হাসিতেছেন। কেহ বা কোলাকোলি করিতেছেন। হরিপ্রেমের বিচিত্র লীলা খেলা। সেই সঙ্গে গান, আর নৃত্য। নৃত্য গীতে মাতিয়া ভক্তবৃন্দ মত্তমাতঙ্গবৎ গলাগলি ঢলাঢলি করিতে লাগিলেন। বালিকা এবং মহিলাগণ মুক্তকেশে সারবন্দী দাঁড়াইয়া কেহবা সুগন্ধি বারি এবং পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন। কেহ মঙ্গলগীত গাহিতেছেন। আহা কি অপূর্ব্ব শোভা! আলুলায়িত নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তলকলাপের সম্মুখে সহাস্য সুন্দর বদনকমলশ্রেণী যেন ঘন মেঘমালার কোলে শত সহস্র চাঁদের উদয়। এক সঙ্গে এক সুরে শত শঙ্খ বাজিতেছে। পরে "আজ কি আনন্দ রে, হরির নববৃন্দাবনে!" এই মধুর কীর্ত্তনের লহরী উঠিল। বেলা তখন তিনটা। তাল মান সুর স্বর নাই, বাঁধা গান নাই, প্রেমমদিরাপানে মত্ত হইয়া সকলে নাচিতে এবং গাইতে লাগিলেন। ক্ষেপা মায়ের আজ আর আনন্দের সীমা নাই।

অপর ভক্তেরা কেহ কোমর বাঁধিয়া বড় হাতপাখা লইয়া বেহারা হইয়া ভক্তগণকে বাতাস করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে তৎসঙ্গে একটু নাচিয়া লইতেছেন। কোন এক রসিক ভক্ত ছানা মাখন ক্ষীর সন্দেশ কলা দধি এক সঙ্গে মাখিয়া সকলের মুখে মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ নিমন্ত্রিত স্ত্রী পুরুষদিগের আহার পানের জন্য মহা উদ্যমে পরিশ্রম করিতেছেন। বসুন্ধরা নারীদিগের এবং গদাধর পুরুষদিগের পা ধোয়াইয়া দিতে লাগিলেন। তাহাতে কাহারো আপত্তি কিম্বা সঙ্কোচ দেখা গেল না। প্রত্যেকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আর ইঁহারা দুই জনে ভক্তিপূর্ব্বক পদধৌত করিয়া দিতেছেন। দেখিয়া আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। শেষে চাহিয়া দেখি, যাহাদের পদধৌত করা হইতেছে, তাহাদের দুই চক্ষে

অজস্র জলধারা বহিতেছে।' যাহারা পাপী তাহারাও ইহাতে তরিয়া যাইতেছে।

এক জন বলিলেন, "আমরা তবে কারা ?" বিশ্বম্ভর তদুত্তরে হাস্য মুখে ঈশারায় বলিলেন, "আমরা সেই তারা।" এই মৃদু মধুর বিশ্বাসবচনে হৃদয়ে হৃদয়ে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিল। পুলকে ভক্তবৃন্দের শরীর কন্টকিত হইল। আহা মরি মরি! যেন শত শত কদম ফুল এক সঙ্গে ফুটিয়া হাসিতেছে।

এই কথায় ইহ পরকাল স্বর্গ মর্ত্ত্যভেদ ঘুচিয়া গেল। একে সমস্ত একাকার হইল। ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন সভ্যগণ এই মহা ব্যাপার দেখিয়া একবারে হজ বড় ল হইয়া রহিলেন। আজ ভাবাবেশে তাঁদের বাক্য বন্ধ, তর্ক বিতর্ক বিবাদ বিতণ্ডার আর অবকাশ নাই। প্রার্থনার ছলে কেহ যে কাহারো উপর ঝাল ঝাড়িবেন, সেরূপ নীচ জঘন্য কামনা নাই।

উপাসনার স্থানে পুরাতন এবং নূতন ভাই ভগিনী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগকে দেখিয়া অমরনাথ মনে মনে বলিলেন, "হায়! তেজচন্দ্র যদি বাঁচিয়া থাকিত, সেও হয়ত আজ অনুতাপ করিয়া দলভুক্ত হইয়া যাইত।"

আজিকার উপাসনা আর ভাঙ্গে না। আমাদের পুঁথি বাড়িয়া গেল, কিন্তু ইহাদের ভাবস্রোত বন্ধ হইল না। ইতিপূর্ব্বে যিনি যিনি বিশ্বম্ভরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা একে একে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত হইতে লাগিল। যে ছিল বিষয়ী সংসারাসক্ত, সে হইল বৈরাগী; অহঙ্কারী বিনয়ী হইল, কঠোর কুতার্কিক জ্ঞানী ভক্ত হইল, বিলাসী অনাসক্ত হইল, পর আত্মীয় এবং আত্মীয়েরা পরমাত্মীয় হইল।

উপাসনান্তে যখন সকলে ভাবে মগ্ন হইয়া এইরূপে বসিয়া আছেন, কাহারো নয়ন মুদ্রিত, কাহারো উন্মীলিত, তখন একটী ললিত চর্ম্ম পলিত শির ঋষিমূর্ত্তি বৃদ্ধ হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া মৃদু স্বরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমি আজ এখানে নববৃন্দাবনের ছবি দেখিলাম। আহা! এ পৃথিবীতে সে সুন্দর ছবি যে দেখিতে পাইব তাহা কখন মনে করি নাই।"

বৃদ্ধের ঋষিমূর্ত্তি, সুমধুর বচনাবলী, বিনীত স্বভাব দেখিয়া শুনিয়া ভক্তমণ্ডলী সচকিত নয়নে তাঁর পানে চাহিতে লাগিলেন। "কে এই সাধু? কোথা হইতে আসিয়াছেন?" পরস্পর এই কথা কানাকানি হইতেছে, এমন সময় বিশ্বম্ভর কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাত! আপনি কে? আমাদিগকে পরিচয় দিয়া সুখী করুন।"

বৃদ্ধ। আমি, তুমি।

বিশ্বম্ভর। তাহাত দেখিতেছি, কিন্তু বলুন কোথা হইতে আসিয়াছেন?

বৃদ্ধ। আমি নববৃন্দাবন হইতে আসিয়াছি।

এ কথা শুনিয়া সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

বিশ্ব। সে কেমন বিস্তার করিয়া বলুন। নববৃন্দাবনের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু সে কোথা? এবং কত দূরে? এই বলিয়া তিনি নয়নজলে প্লাবিত হইলেন।

বৃদ্ধ। তাহা পৃথিবীর অতীত স্থানে। তোমরা আমাকে চিনিতে পারিলে না?

অমর। একটু যেন চেন চেন করিতেছি। কে আপনি?

বৃদ্ধ। আমি তোমাদের সেই হতভাগ্য বদে আঙ্কেল্।

এই কথা শুনিয়া সকলে বিস্মিত, সচকিত এবং আনন্দপুলকে রোমাঞ্চিত হইলেন। বিশ্বম্ভর তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন, পদধূলি লইলেন চারিদিকে মহা আন্দোলন উঠিল। মহা বিস্ময়ের সহিত মহা আহ্লাদ মিশিল। সকলে অবাক্ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তাইত, এমন পরিবর্ত্তন! আহা ঠাকুরের কি বিচিত্র লীলা!"

বিশ্ব। আপনি নববৃন্দাবন কিরূপে চিনিলেন,? সেখানে গেলেনই বা কি প্রকারে?

বৃদ্ধ। মহাত্মা পূর্ণানন্দ স্বামীর সঙ্গে চাকর হইয়া তথায় গিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি গুরুদেবের আদেশে তোমাদিগকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি।

এই সংবাদ পাইয়া মুমুক্ষু সাধু সাধ্বীগণ মহানন্দে হরিধ্বনি করিলেন, এবং তীর্থযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পর দিন শ্রীদরবার মন্দিরে ভক্তবৃন্দের অধিবেশন। শান্তিধামের সুপক্ক ফলস্বরূপ দ্বাদশটী বিশ্বাসী আত্মার উপর ধর্ম্মরাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া বিশ্বম্ভর নববৃন্দাবনে যাত্রা করেন।

উচ্চ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত অতি প্রশস্ত উন্নত এই দরবারভবন। বড় বড় মোটা মোটা থাম স্বর্ণ বর্ণে চিত্রিত। মহার্ঘ বস্ত্ররাজীতে এবং বহুবিধ কারুকার্য্যসমন্বিত অমূল্য বসনে তাহার অভ্যন্তর ভাগ ঝলমলায়মান। দ্বার-দেশে মহারাজ সুচেত সিংহ দৌবারিক বেশে দণ্ডায়মান। যেন স্বয়ং ধর্ম্মরাজ বিচারপতি প্রশান্তভাবে সেই ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া আছেন। অতি গম্ভীর পবিত্র স্থান। ন্যায় ধর্ম্ম যেন সেখানে মূর্ত্তিমান। একটু অসার কথা কিম্বা কুটিল চিন্তা বা কুমন্ত্রণা তন্মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় না।

সভাবেদীর চারিধারে দরবারের সভ্য দ্বাদশটী আত্মা যখন ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া যোগাসনে বসিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে তৎক্ষণাৎ পবিত্রাত্মার জ্বলন্ত আবির্ভাব অবতীর্ণ হইল, সকলের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন সমবেত হৃদয়ে এক অবিভক্ত আদেশপ্রবাহ বহিতে লাগিল। স্বর্গীয় অগ্নিশিখা সকলের আত্মাকে অগ্নিসংস্কার করিয়া দিল।

সেই শ্রীদরবারের হস্তে সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত-পূর্ব্বক বিশ্বস্তর বিদায় গ্রহণ করিলেন। নববৃন্দাবনের যাত্রিদল পথে বাহির হইল।

তখন পুরুষের গম্ভীর স্বরের সহিত নারীগণ মধুর সুললিত স্বর মিলাইয়া এই নব সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

"চল যাই নববৃন্দাবনে।
আনন্দ মনে, হরি হরি বলে বদনে।
ঐ দেখা যায় নব উষা, নব ভারতগগনে।
নবীন মূরতি ধরি, করেন যেখানে হরি,—
নবলীলা ভকতসনে ;
সেরূপ আনন্দ ঘন, যোগীহৃদয়রঞ্জন,
নিরখিব নব নয়নে।
নবীন বৈরাগী বেশে, নব ভক্তি প্রেমাবেশে,
নবরাগে নব রসোল্লাসে, (নব দেব দরশনে)—
(চল চল যাই রে,— মত্ত মাতঙ্গের মত)
লয়ে নব ভালবাসা, নবোদ্যম নব আশা,
নবোৎসাহে নবীন বিশ্বাসে ;
(চল চল যাই রে,—প্রাণসখার দরশনে)

বিধান নিশান ধরি, বাজাযে বিজয় ভেরী,
নবনারী মিলে এক প্রাণে ; (চল চল যাই রে)
নিরখি সখার মুখ, পাসরিব সব দুখ,
মাতিব আনন্দসুধা পানে।
হরির কৃপায সবে, জীবন্মুক্তি পাব ভবে,
প্রবেশিব নব জীবনে।
কিবা নবরসে রঞ্জিত, নবভাবে শোভিত,
আকাশ অবনী জল স্থল ;
নব নিরমলাকাশে, নবীন নীরদ ভাসে,
হাসে নব দামিনী সকল।
কিবা নব রবি শশী তারা, বরষে আনন্দধারা,
নবরাগে করে ঝলমল ;
নববসন্ত সমীরে, নাচিতেছে ধীরে ধীরে,
নদী সরোবর সিন্ধুজল।
প্রকৃতি নব যৌবনে, সাজিয়া নব ভূষণে,
সপ্ত স্বরে গায হরিনাম ;
নব কিশলযে সাজি, তরুলতা বনরাজী,
বিকাশে নব কুসুমদাম।

এই নবীন সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি যখন মহানগরের আকাশকে কম্পিত করিল, তখন চারিদিক টলমল করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন সমস্ত লোক এই সঙ্গে মহাভাবে বিহ্বল হইযা নববৃন্দাবন দর্শনে চলিল। বিশ্বম্ভর যেন সমস্ত বিশ্বধাম হৃদযে ধরিয়া নববৃন্দাবন ধামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি জ্যোৎস্নালোকে রঞ্জিত, মৃদু মন্দ পবন বহিতেছে, আনন্দে মাতিযা হরিনাম গাইতে গাইতে যাত্রিদল ক্রমে নির্ব্বাণনদের তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। ইহার পরপারে নববৃন্দাবন। নিশি অবসান প্রায়, উষার

মৃদু আলোকে পূর্ব্ব গগন ঈষৎ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছে, বিহঙ্গকুল কলনাদে প্রভাতসঙ্গীত গাইতেছে। দেখিতে দেখিতে লোহিত বরণ তরুণ তপন উদয়াচল আলোকিত করিল, তাহার সুনির্ম্মল সুস্নিগ্ধ প্রদীপ্ত আভা নির্ব্বাণ নদের গাঢ় নীলিমায় প্রতিফলিত হইল, নববৃন্দাবনের সুন্দর ছবি হাসিল।

তখনও "ঐ দেখা যায় নবউষা, নবভাবতগগনে" এই গীতাংশ নদ হ্রদ কানন ভূধর আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। পরে যখন যাত্রিগণ ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে নির্ব্বাণনদের শান্তিসলিলে পিতা পুত্র পবিত্রাত্মার নামে অবগাহন করিয়া প্রাতঃকালীন ব্রহ্মস্তোত্র সমস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের মুখমণ্ডল এবং সর্ব্বশরীরে যেন হেমকান্তি বিভাসিত হইল, আর্দ্র কেশ কলাপ হইতে গলিত স্বর্ণবিন্দু সকল ঝরিতে লাগিল, নবরবির স্বর্ণময় কিরণে দিঙ্মণ্ডল সমুজ্জ্বলিত হইল।

জলসংস্কার এবং অবগাহনান্তে নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক তাঁহারা দেখিলেন, পরপারস্থিত নাতিদীর্ঘ শ্বেতমর্ম্মর পর্ব্বতসোপান হইতে তুষার বর্ণ শুভ্রমূর্ত্তি দেবদূতগণ এক দিব্য সেতু স্কন্ধে লইয়া নামিয়া আসিতেছেন। ক্রমে সেই সেতু নদের উপরিভাগে সংরক্ষিত হইল। সেতু স্থাপন পুরঃসর দেবদূতগণ ঊর্দ্ধমুখে মধুর গম্ভীর নাদে স্বর্ণতূরী বাজাইতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে যাত্রিগণের হৃদয় মহানন্দে নাচিয়া উঠিল। অনন্তর তাঁহারা সেই অপূর্ব্ব সেতু অবলম্বনপূর্ব্বক পরপারে উপনীত হইলেন। "বিধান সেতু" উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে এই শব্দটী তাহাতে জ্বলিতেছিল। পূর্ণানন্দ স্বামী প্রসারিত বক্ষে যাত্রিদিগকে গ্রহণ করিলেন।

নববৃন্দাবন ধাম এক অত্যুচ্চ হিমশিলা সদৃশ শ্বেত প্রস্তরের পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত, শ্রেণী চতুষ্টয়ে ক্রমশঃ উন্নত। তথায় নির্ম্মল নির্ঝরের পয়প্রণালা পথের উভয় পার্শ্বে নিরন্তর বহিয়া যাইতেছে, এবং নবকিশলয়শোভিত হরিদ্বর্ণ বৃক্ষশ্রেণী বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত কুসুমদামে শোভা পাইতেছে, সুমন্দ মলয়ানিল তাহার সুধাময় পরিমল দশ দিক আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। পশু পক্ষী উদ্ভিজ্জ মানব মানবী দেব দেবী সখ্যভাবে মিলিত হইয়া সর্ব্বত্র নিরাপদে বিচরণ করিতেছে। যাত্রিদলের শুভাগমনবার্ত্তা শ্রবণে নববৃন্দাবনবাসিগণ উক্ত সোপান শ্রেণী চতুষ্টয়ের শৃঙ্গোপরি পর পর ঊর্দ্ধে নীল পীত লোহিত পতাকা হস্তে দাঁড়াইয়া অভ্যুত্থান করিতে লাগিলেন। দেবশ্রীসম্পন্ন সেই সকল মূর্ত্তির কি মনোহর নয়নরঞ্জন শোভা! দেবকন্যাগণ শ্বেতপদ্মের ন্যায় কমনীয় কান্তিতে

দিক আলোকিত করিয়া সমতানে শত শত শঙ্খ বাঁজাইতেছেন। তাঁহাদের অনুপম সহাস্য মুখশ্রী দর্শনে যাত্রিগণ আহ্লাদে পুলকিত হইলেন। সিদ্ধাত্মা মুক্ত পুরুষ প্রকৃতির প্রসন্ন বদনের সৌন্দর্য্যে এবং তাঁহাদের সুধাময় সাদর সম্ভাষণে বিমোহিত হইয়া সদলে বিশ্বম্ভর পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন এক অনন্ত হরিনামধ্বনি এক সুরে, একভাবে দুই দিক হইতে সমুত্থিত হইল। অতঃপর উভয়ে এক প্রেমে মাতিয়া জলবিন্দু যেমন জলে মিশিয়া যায় তদ্রূপ সকলে এক হৃদয়, এক প্রাণ, এক আত্মা হইয়া গেলেন।

অনন্তর পথদর্শক সাধু বৈদ্যনাথ পূর্ণানন্দ স্বামীর পশ্চাতে থাকিয়া যাত্রিদিগকে একে একে তত্রত্য কীর্ত্তি সমুদয় বুঝাইয়া দেন।

প্রথম স্তবকে উঠিয়া যাত্রিদল দেখিলেন, নর নারী বালক বালিকা নানাবিধ সৎকর্ম্মে ব্রতী রহিয়াছে। বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র, মহাকার্য্যসমারোহ। বিদ্যুতের গতিতে সকলে আপন আপন কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। যেন মহাশক্তি সেখানে মূর্ত্তিমতী। সেবকবৃন্দ সেই শক্তিকে অনলসে মহা উদ্যমে পূজা করিতেছে। অসংখ্য প্রকার সদনুষ্ঠান। কোথাও বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র, বাণিজ্যভবন, কোথাও শিল্পাগার, বড় বড় কারখানাতে অসংখ্য প্রকারের সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী পিপীলিকার ন্যায় তাহাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। ধুম্ দাম্ ঝক্ ঝক্ শোঁ শোঁ ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠিতেছে। অসংখ্য অগণ্য বিদ্যামন্দির, চিকিৎসালয়, অতিথিশালা, দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। প্রভূত বেগে শক্তিস্রোত বহিয়া যাইতেছে। তাহার উপরে নর নারী ভাসিতেছে। পৃথিবীতে মহানগরীমধ্যে প্রজাপুঞ্জ সচরাচর যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে তৎসমুদয়ই সেখানে বিদ্যমান। কিন্তু কার্য্যের উদ্দেশ্য এবং ভাব নূতন বিধ। তাড়িত প্রবাহের ন্যায় কার্য্যের গতি হইলেও কাহারো সঙ্গে কাহারো প্রতিঘাত লাগে না। সামান্য এক জন ভারবাহী কুলির সহিত প্রকাণ্ড এক রাজপুরুষের বন্ধুভাব। নিজ নিজ পদে এবং কার্য্যে প্রত্যেকেই স্বাধীন, অথচ পরস্পরের অধীন। পরিশ্রমে শরীর ঘর্ম্মাক্ত, কিন্তু মুখগুলি যেন হাসিতে প্রফুল্ল শতদল পদ্মের মত। হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ মস্তিষ্ক অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াও যদি পড়ে, তথাপি কাহারো মুখে একটু বিরক্তির ভাব, কিংবা কঠোর কথা বাহির হইবে না। কোন দুর্ব্বল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যদি কোন একটা তৈয়ারি কাজ নষ্ট করিয়া

ফেলে; উপরওয়ালা ব্যক্তি একটী হাসিতে তাহাকে মাটি করিয়া দেন। পৃথিবীর সহস্র বেত্রাঘাত আর এখানকার একটু মৃদু হাসি সমান। নরলোকে ফাঁসি, দ্বীপান্তর বাস, এ রাজ্যের একটু অপ্রসন্নভাব তুল্য।

কত প্রকার কার্য্যই এখানে দেখা যায়। পারিবারিক গার্হস্থ্য সামাজিক কর্ম্ম, অন্ন দান বস্ত্র দান, সাধুভক্ত সেবা, পশু পক্ষী উদ্ভিদ সেবা। ব্রতধারণ, যাগ যজ্ঞ পূজা পার্ব্বণ দীনসেবা, কাজের আর অন্ত নাই।

এই কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্ম কেবল দৈহিক শক্তি বা বুদ্ধি কৌশলে সম্পন্ন হয় না। ইহা কর্ম্মযোগ সাধন। যেমন বাষ্পীয় শক্তি এক স্থানে ঘনীভূত হইয়া ওয়ার্কসপের শত শত যন্ত্রকে মহাবলে চালিত করে, তথায় তেমনি এক ব্রহ্মশক্তি প্রত্যেক নরনারীর হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ শিরা স্নায়ু মাংসপেশী এবং বুদ্ধি বিবেকের ভিতরে অবিশ্রান্ত বেগে গতায়াত করিতেছে। সুতরাং এখানে মানুষ কাজ করে না, স্বয়ং ব্রহ্মই কার্য্য করেন। মনুষ্য সকল যন্ত্রবৎ তাঁহার শক্তিতে কেবল ঘুরিতেছে। সেই শক্তি অনুভব করিয়া কর্ম্মিগণ কর্ম্মানন্দ এবং সেবানন্দ সম্ভোগ করেন, এই জন্য এখানে কার্য্যেতে কোন বিঘ্ন বিবাদ ঘটে না। আর একটী মজা এই, কেহ আপনার জন্য কাজ করে না, এবং ভাবেও না, সমস্ত সমাজের জন্য; অথচ প্রতি জনের অভাব আপনা আপনি মোচন হইয়া যাইতেছে। কর্ম্মযোগে যোগী দাসদাসী সকল প্রতি কার্য্যের শক্তি বুদ্ধি, তাহার সিদ্ধির উপায় ও উদ্দেশ্যের ভিতর আদি শক্তি সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে কর্ত্তারূপে নিরন্তর দর্শন করেন। ফলাফলের জন্য কেহ চিন্তিত বা ভীত নহেন। ভগবৎ শক্তিতে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, সুতরাং কাহারো দায়িত্ব ভাবনাও নাই। দাসের আবার দায়িত্ব কোথা? তাঁহারা সেবানন্দে সর্ব্বদা আনন্দিত। বিষণ্ণ বদনে বিরক্ত ভাবে একটী লোকও এখানে কার্য্য করিতেছে না। বাঁশী বাজাইতেছে, গীত গাহিতেছে, হাসিতেছে, মুড়িকড়াই, চানাচুর খাইতেছে, আমোদ পরিহাস গল্প করিতেছে; আর খাটিতেছে। ঠিক যেন নিত্যানন্দের বাজার বসিয়াছে। এইখানে কাজ করিতে করিতে ক্রমে জ্ঞানতৃষ্ণা তত্ত্বপিপাসা বলবতী হয়, তখন কর্ম্মীরা জ্ঞানসোপানে আরোহণ করে।

দ্বিতীয় সোপানে জ্ঞানবিভাগ। চসমানাকে কেশহীন বৃহৎ মস্তকধারী বৈজ্ঞানিক দার্শনিক নীতিবিশারদ এবং ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিস্তব্ধ গম্ভীর ভাবে পুরাণ ইতিহাস এবং সর্ব্ববিধ বিজ্ঞান, বেদ বেদান্ত প্রভৃতি অপরা

বিদ্যা ছাত্রবৃন্দকে পড়াইতেছেন, কেহ বা শাস্ত্র লিখিতেছেন। বেদ বাইবেল কোরাণ ললিতবিস্তার জেন্দভেস্তা ইত্যাদি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ সকল একত্র স্থাপিত রহিয়াছে। বড় বড় পুস্তকালয়ে পর্ব্বত সমান গ্রন্থরাশি। কোন গৃহে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। এখানে নিত্য নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার হয়।

এখানকার লোকেরা সকলেই অনন্যমনস্ক। তাঁহারা দিব্যজ্ঞাননেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে জড় জীবে, প্রতি পরমাণুতে, আকাশে, জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে, পাতালে ভূস্তরে, দেহে এবং মানবাত্মার অভ্যন্তরে এক অদ্বিতীয় অখণ্ড জ্ঞানময় পুরুষের অদ্ভুত বিজ্ঞানকৌশল এবং শুদ্ধ চৈতন্যের লীলা দেখিতেছেন। যাবতীয় বিজ্ঞান বিভাগ এখানে একত্র মিলিত হইয়া জ্ঞানময়ের পদচুম্বন করিতেছে। পৃথিবীর জ্ঞানীরা ইহা না বুঝিতে পারিয়া দলাদলি করিয়া মরে। জ্ঞানের শাখা প্রশাখা অসংখ্য অযুত, কিন্তু মূল এক। পৃথিবীতে যাহারা জ্ঞান লইয়া দলাদলি করিত, এখানে তাহারা এক হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানদেবতার দর্শনে অভেদাত্মা হইয়াছে। তত্ত্ববিদ্‌গণ জ্ঞান লাভ করিয়া যতই পণ্ডিত হইতেছেন, ততই আপনাদিগকে অজ্ঞ বালকবৎ মনে করিতেছেন। যে পরিমাণে তাঁহাদের বিজ্ঞানদৃষ্টি প্রসারিত এবং পরিষ্কৃত হইতেছে, সেই পরিমাণে অনন্তের জ্ঞানরাজ্যের সীমা এবং গভীরতা বাড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের অজ্ঞানতা ক্রমে বৃদ্ধিই হইতেছে। পৃথিবীতে বি, এ, এম, এ, পাস করিলেই বিদ্যার শেষ হয়, এখানে জ্ঞানীরা কেবল বলেন, "আমরা কিছুই জানি না, এই মাত্র জানি।" পৃথিবীর ক্ষুদ্রাশয় অল্পমতি লোকেরা ক্ষুদ্র জ্ঞান লাভ করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হয় এবং ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিদিগকে মূর্খ বলে। এ রাজ্যে সকলেই বালকবৎ সরল। বিজ্ঞানসমুদ্রের গভীরতা দেখিয়া দেখিয়া, তাহার ভিতরে নামিয়া নামিয়া শেষ আর তাঁহারা বাড়ী ফিরিবার পথ খুঁজিয়া পান না, সুতরাং পরিণামে আত্মহারা হইয়া অনন্তে মিশিয়া যান। তাঁহারা আদিজ্ঞান পরমজ্ঞান ঈশ্বরেতে সমস্ত বিজ্ঞান বিকাশের মিলন সামঞ্জস্য দেখিতেছেন। এই জ্ঞানীদিগের চক্ষে জ্ঞান সভ্যতার উন্নতি ঈশ্বরবিকাশ ভিন্ন আর অন্য কিছু নহে। এই জ্ঞান ব্রহ্মদর্শনের নামান্তর মাত্র।

তদনন্তর তৃতীয় সোপানে উঠিয়া যাত্রিগণ দেখিলেন, যোগীদিগের যোগাশ্রম। বিস্তীর্ণ শৈলমালা এবং বনরাজীর অভ্যন্তরে নির্ঝরতটে এক একটী

কুটীর; সেখানে কেহ যোগশিক্ষা দিতেছেন, কেহ ধ্যান সমাধিতে মগ্ন আছেন সংযত চিত্ত আত্মারাম যোগী সকল নীরবে আত্মার ভিতরে বাহিরে পরাবিদ্যার আলোকে কেবল অনন্ত চিদাকাশ অবলোকন করিতেছেন। তাঁহাদের শরীর স্পন্দহীন, নয়ন কাহারো স্থির উন্মীলিত, কাঁহারো নিমীলিত, এবং নিশ্বাস অন্তরমুখী, মূর্ত্তি সৌম্য প্রশান্ত। অবাতকম্পিত দীপশিখাবৎ যুগ যুগান্তর তাঁহারা এক ভাবে বসিয়া আছেন। বাহ্য জ্ঞান নাই। কিন্তু মুখ শান্তিরসে পরিপূর্ণ। শত শত যোগী এই ভাবে নীরবে নিত্যযোগে বিহার করিতেছেন। যোগবিদ্যাবিশারদ মহাত্মাগণ অধ্যাত্ম রাজ্যের তত্ত্ব সকল এমনি বিশদরূপে শিক্ষার্থিদিগকে বুঝাইয়া যোগসাধন করাইতেছেন, যেন সেই অদৃশ্য রাজ্য চিত্রপটের ন্যায় তাঁহাদের মানসচক্ষের নিকট নিরবধি জ্বলিতেছে। আসন নিয়ম সংযম শম দম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসন যোগ সমাধি একটীর পর একটী যেন সোপান স্বরূপ উজ্জ্বলরূপে তাঁহাদের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যেমন সূক্ষ্ম দর্শন, তেমনি তাহার পরিষ্কার ব্যাখ্যান। যোগীরাও মহাযোগে স্রষ্টার সঙ্গে একাকার। অগ্রে যেখানে "আমি" "আমি" শব্দ উত্থিত হইত, সেখানে কেবল "তুমি" "তুমি" এখন সার হইয়াছে। যাত্রিদলসহ বিশ্বম্ভর যোগজীবন দর্শন এবং যোগতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া শান্তিরসার্দ্রচিত্তে চতুর্থ শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন।

চতুর্থ শৃঙ্গের উপরিভাগে এক খণ্ড নবীন তৃণাচ্ছন্ন সমতল ভূমি, তাহার মধ্যস্থলে গোলাকার একটী গৃহ, চারিদিকে কুসুমিত পুষ্পোদ্যান এবং কমল-শোভিত নির্ম্মল সরসী। অলিবৃন্দ তাহাতে গুন গুন স্বরে গান করিতেছে। গোলাকার গৃহমধ্যে প্রমত্ত ভক্তগণ বৃত্তাকারে সঙ্কীর্ত্তনের সহিত নব-নৃত্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল শঙ্খ ঘণ্টার বাদ্যনাদে চারিদিক ধ্বনিত হইতেছে। "হরি বলে দেবগণে নাচে" এই গান সকলে গাহিতেছেন। প্রেমমদিরা পানে মত্ত হইয়া ভক্তগণ নানা রঙ্গভঙ্গে নাচিতেছেন, কোলাকোলি আলিঙ্গন দানে পরস্পরকে আমোদিত করিতেছেন। তাঁহাদের অনুরাগপূর্ণ গভীর স্বরলহরী, গলদশ্রুলোচন, বিনম্র মধুর এবং সুকোমল ব্যবহার দর্শনে যাত্রিগণ সাষ্টাঙ্গে ভূমি লুটাইতে লাগিলেন, এবং সেই সঙ্কীর্ত্তনের সুরে সুর মিলাইলেন।

সর্ব্বোপরি নববৃন্দাবনের শ্রীমন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে রত্ন সিংহাসনে স্থিরসৌদামিনীবৎ মা আনন্দময়ী বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার চারিদিকে

অমরাত্মা ভক্তবৃন্দ। সিংহাসনারূঢ়া সেই মহাদেবী ভগবতীর হাস্যমুখের মধুর দ্যুতি পারিষদ ভক্ত সন্তানগণের মুখে প্রতিভাত হইতেছিল। যেন পূর্ণচন্দ্রের চারি ধারে গ্রহ তারকাবলী। সিদ্ধাত্মাগণের হৃদয়ফলকে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দেবতার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছবি অঙ্কিত হইয়া তাঁহাদের মুখমণ্ডলে, নয়নদর্পণে তাহারই প্রতিবিম্বচ্ছটা জলন্ত জ্যোতিতে ঝলমল করিতেছিল। এখানে সেব্য সেবক, উপাস্য উপাসকগণ মহাযোগে এবং মহাভাবে সমস্ত একাকার, তন্ময় এবং মহামিলনে সম্মিলিত। সব জাতি এক জাতি। আহা! সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভক্ত-জীবনে পূর্ণব্রহ্মের কি সুন্দর বিকাশ! এ রাজ্যে কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি আর পৃথক্ ভাবে দৃষ্ট হয় না, পরস্পর পরস্পরের সহিত মিশিয়া এক অভিনব চরিত্র গঠন করিয়াছে; প্রত্যেকের ভিতর প্রত্যেকটী অনুপ্রবিষ্ট, সংমিলিত, এবং একীভূত। পশ্চাতে যাত্রিদল, অগ্রে বিশ্বম্ভর; আপনার হৃদিস্থিত অস্পষ্ট আদর্শ ছবির এই পূর্ণবিকসিত প্রতিমূর্ত্তি যখন তিনি দেখিলেন, তখন আর অগ্রসর হইতে তাঁহার সাহস হইল না; অদূরে সচকিত নয়নে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ সে অত্যুজ্জ্বল স্বর্গীয় প্রভা ধারণ করে কার সাধ্য! তদীয় অনুচরবৃন্দ বিস্ময়াবিষ্ট এবং বিহ্বল চিত্ত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। পরে বিশ্বম্ভর ভয় এবং ভক্তির সহিত আরো দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া দিব্য নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এক অবিকল ব্রহ্মমূর্ত্তি প্রতি জনের স্বভাবে অলদক্ষরে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। তাহা দর্শনমাত্র আপনার অন্তর-নিহিত অস্ফুট আদর্শ জীবন তৎক্ষণাৎ পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইল এবং তাহার জলন্ত প্রভাব যাত্রিগণের উপর আসিয়া পড়িল। তখন সকলে পুলকে কদম্বাকৃতি হইয়া ভক্তগণপরিবেষ্টিত ভগবতী মহাদেবীর চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। এবং ধূল্যাবলুণ্ঠিত হইয়া এই প্রণামসঙ্গীত গাইতে লাগিলেন;—

"দেহি মাতঃ দেহি মাতঃ দেহি অভয় পদে স্থান,
কর গো কর বর দান,—পবিত্রাণ বিধান।
লইনু শরণ মা তোমার চরণে, তার তার নিজগুণে, অনাথ দীন জনে।
জয় বিঘ্ননাশিনী, ত্রিতাপহারিণী, ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী;
অনন্ত রূপিণী, ভুবনমোহিনী, তারিণী বিশ্বপালিনী,
জননী, জগদম্বে অম্বে অম্বালিকা সতী,
অভয়ে অনাদ্যে আদ্যাশক্তি, চিন্ময়ী ভগবতী।

দণ্ডবৎ প্রণিপাত করি সবে লুটায়ে ধরণী ;
ডাকি সকাতরে, ব্যাকুল অন্তরে, উদ্ধার পতিতপাবনী ;
সঁপিয়ে জীবন পড়িয়া রহিনু সকলে ;
রাখ গো ভক্তবৎসলে, তোমার পদতলে।
অনন্ত মিলনে, সুরগণসনে হয়ে এক পরিবার ;
যুগ যুগান্তরে, লোক লোকান্তরে গাইব যশ তোমার ;
বিতর প্রসাদ সর্ব্বজনে সর্ব্বেশ্বরী ;
বল "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি," জননী ক্ষেমঙ্করী।"

সঙ্গীতের সুমিষ্ট ধ্বনিতে স্বর্গলোক পরিপূর্ণ হইল, দেবকন্যাগণ এই প্রণত মস্তকোপরি পুষ্প বৃষ্টি করিলেন, অমরগণ জয়গীত গাইলেন। প্রসন্ন বদনা জননী নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী স্নেহহস্ত বিস্তারপূর্ব্বক চরণাশ্রিত শ্রান্ত পাথকদিগকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার পবিত্র করস্পর্শে যাত্রিগণের রূপান্তর প্রাপ্তি হইল। অনন্তর তাঁহারা নবজীবনে অনন্তজীবনে প্রবেশপূর্ব্বক নিজ নিজ স্বভাবে স্বতন্ত্র থাকিয়া চিরউন্নতি সহকারে সচ্চিদানন্দের অনন্ত ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া পূর্ব্বাপর বিশ্বাসী ভক্ত মহাজনগণের আশা পূর্ণ হইল। এক্ষণে কাগজ কলম ফেলিয়া দিয়া মা আনন্দময়ীর এই নববৃন্দাবনে আমিও তাঁহার সুপুত্র সাধুগণের পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকি।

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"।

[সমাপ্ত।]